www.bdniyog.com

বাংলাদেশের

জেলাসমূহের

নামকরণের ইতিহাস

(দর্শনীয় স্থান ও জেলা মনে রাখার কৌশল)

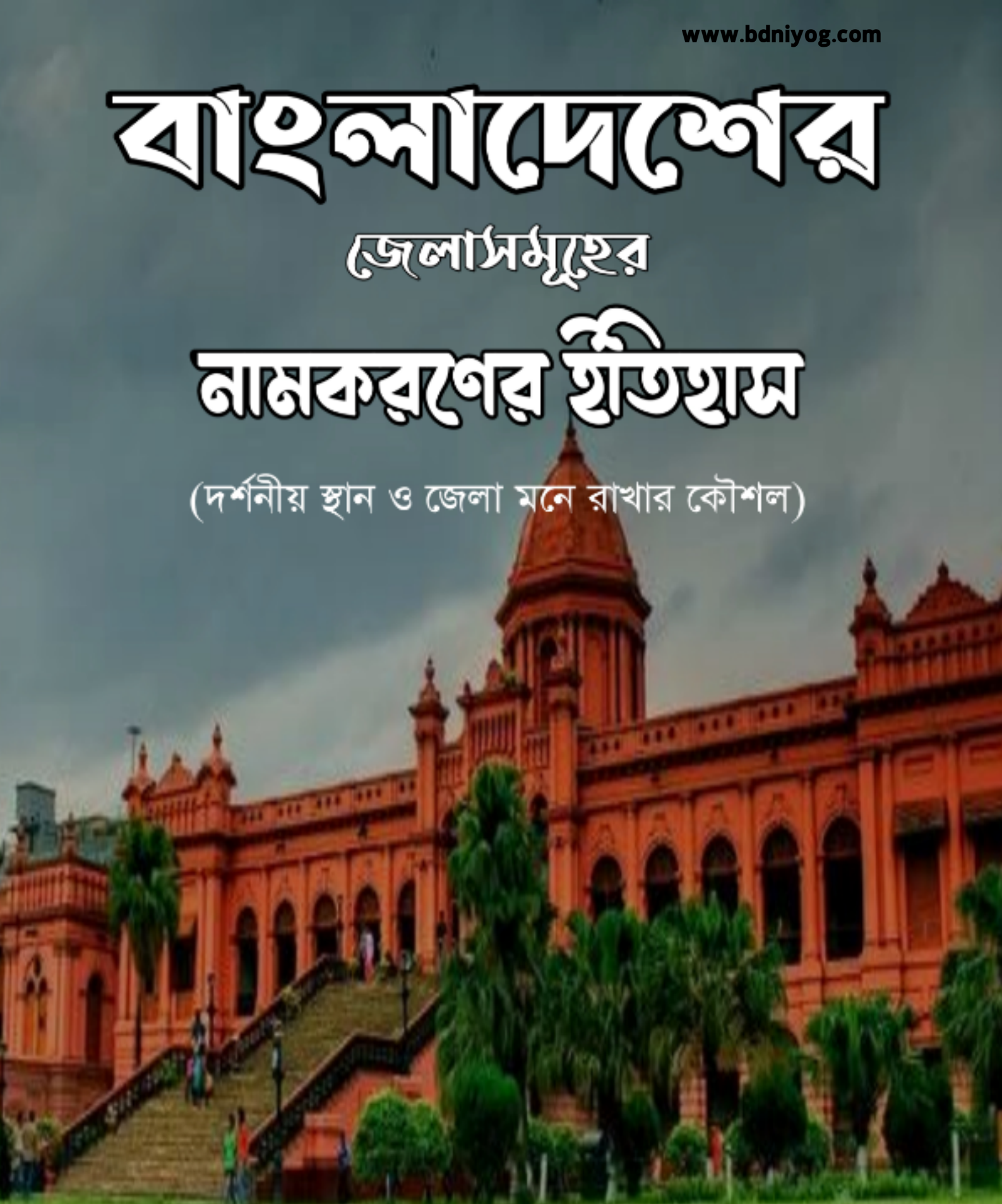

নাজিম খান

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

বাংলাদেশের

জেলাসমূহের

নামকরণের ইতিহাস

নাজিম খান

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

লেখক: নাজিম খান

সম্পাদক: নাজিম খান

প্রচ্ছদ: নাজিম খান

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

উৎসর্গ

বাঙালি জাতিকে।

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

ভূমিকা

পৃথিবীর সবকিছুই যখন হাতের মুঠোয়, তখন বাংলাদেশের ইতিহাস পিছিয়ে পড়বে কেন? তাই চলুন,

ইতিহাস পড়ি,

ইতিহাস গড়ি।

এ বইটিতে বাংলাদেশের সকল জেলার নামকরণের ইতিহাস, তাদের দর্শনীয় স্থানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সেসব জেলার নাম মুখস্থ রাখার কৌশলও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাজিম খান

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

৬ই ডিসেম্বর, ২০২০।

www.bdniyog.com

সূচীপত্র

১. বাংলাদেশের জেলাসমূহ মুখস্থ রাখার কৌশল

২. বাংলাদেশের জেলাসমূহের দর্শনীয় স্থানসমূহ

৩. বাংলাদেশের জেলাসমূহের নামকরণের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়:

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার নাম মনে রাখার কৌশল

রাজশাহী বিভাগ

“চাপাবাজ নাসির।”

- ✔চাপাইনবাবগঞ্জ
- ✔পাবনা
- ✔বগুড়া
- ✔জয়পুরহাট
- ✔নওগা
- ✔নাটোর
- ✔সিরাজগঞ্জ
- ✔রাজশাহী

খুলনা বিভাগ

“মা মেয়ে ঝিয়ে সাত বাঘ খুন করে নড়াইয়্যা যশোরের ডাঙ্গায় ফেলে।”

- ✔মাগুড়া
- ✔মেহেরপুর
- ✔ঝিনাইদাহ
- ✔সাতক্ষীরা
- ✔বাগেরহাট
- ✔খুলনা
- ✔কুষ্টিয়া
- ✔নড়াইল
- ✔যশোর
- ✔চুয়াডাঙ্গা

রংপুর বিভাগ

“পঞ্চ ঠাকুর লাল নীল রঙের কুড়িটি গায়ে দিল।”

- ✔পঞ্চগড়
- ✔ঠাকুরগাঁও
- ✔লালমনিরহাট
- ✔নীলফামারী
- ✔রংপুর
- ✔কুড়িগ্রাম
- ✔গাইবান্ধা
- ✔দিনাজপুর

বরিশাল বিভাগ

“পপির (দুই) বর ঝাল ভালোবাসে।”

- ✔পটুয়াখালী
- ✔পিরোজপুর
- ✔বরগুনা
- ✔বরিশাল
- ✔ঝালকাঠী
- ✔ভোলা

ময়মনসিংহ বিভাগ

“নেত্রকোনার জাম সেরা।”

- ✔নেত্রকোনা
- ✔জামালপুর
- ✔ময়মনসিংহ
- ✔শেরপুর

সিলেট বিভাগ

“মৌলভীরা হবিগঞ্জে সুনাম ছিল।”

- ✔মৌলভীবাজার
- ✔হবিগঞ্জ
- ✔সুনামগঞ্জ
- ✔সিলেট

চট্টগ্রাম বিভাগ

“ব্রাহ্মণ কুমিল্লার লক্ষ্মীকে চাঁদে নিয়ে ফিরনি, চকবার খাওয়ান”

- ✔ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- ✔কুমিল্লা
- ✔লক্ষ্মীপুর
- ✔চাঁদপুর
- ✔নোয়খালী
- ✔ফেনী
- ✔চট্টগ্রাম
- ✔কক্সবাজার
- ✔বান্দরবান
- ✔রাঙ্গামাটি
- ✔খাগরাছড়ি

ঢাকা বিভাগ

“কিগো শরিফের মামু, নর রানাগাজীর টাকা ঢাকায়।”

- ✔কিশোরগঞ্জ
- ✔গোপালগঞ্জ
- ✔শরিয়তপুর
- ✔ফরিদপুর
- ✔মাদারীপুর
- ✔মানিকগঞ্জ
- ✔মুন্সিগঞ্জ
- ✔নরসিংদী
- ✔রাজবাড়ি
- ✔নারায়ণগঞ্জ
- ✔গাজীপুর
- ✔টাঙ্গাইল
- ✔ঢাকা

দ্বিতীয় অধ্যায়:

বাংলাদেশের ৬৪ জেলার দর্শনীয় স্থানসমূহ

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা

১/ লালবাগ কেল্লা (লালবাগ, পুরনো ঢাকা)

২/ আহসান মঞ্জিল (ইসলামপুর, পুরনো ঢাকা)

৩/ বড় কাটরা ও ছোট কাটরা (চকবাজারে, পুরনো ঢাকা)

৪/ কার্জন হল (ঢাকা ইউনিভার্সিটি)

৫/ ঢাকেশ্বরী মন্দির (পলাশী ব্যারাক)

৬/ তারা মসজিদ (আরমানিটোলা, পুরোনো ঢাকা)

৭/ রায়ের বাজার বদ্ধভূমি স্মৃতিসৌধ (রায়ের বাজার)

৮/ ফ্যান্টাসি কিংডম (আশুলিয়া)

৯/ নন্দন পার্ক (নবীনগর, সাভার)

১০/ হাতিরঝিল (রামপুরা, তেঁজগাও, গুলশান এলাকার মাঝে)

১১/ সংসদ ভবন (শেরে বাংলা নগর)

১২/ নভো থিয়েটার (বিজয় স্মরণীর মোড়, তেঁজগাও)

১৩/ মিরপুর বেড়িবাঁধ (মিরপুর)

১৪/ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি (সাভার)

১৫/ স্মৃতিসৌধ (সাভার)

১৬/ শহীদ মিনার (ঢাকা ইউনিভার্সিটি)

১৭/ মৈনট ঘাট (দোহার)

১৮/ গোলাপ গ্রাম (সাদুল্লাহপুর)

মুন্সিগঞ্জ

১/ মাওয়া ফেরিঘাট (মাওয়া)

২/ শ্যাম শিদ্ধির মঠ (শ্যামসিদ্ধি, শ্রীনগর)

৩/ মাওয়া রিসোর্ট (কান্দিপাড়া, লৌহজং)

৪/ আড়িয়াল বিল (শ্রীনগর)

৫/ ভাগ্যকুল জমিদার বাড়ি (বান্দুরা)

৬/ ইদ্রাকপুর দুর্গ (মুন্সিগঞ্জ জেলা সদর)

৭/ পদ্মা রিসোর্ট (লৌহজং)

৮/ সোনারং জোড়া মঠ (সোনারং, টঙ্গীবাড়ি)

৯/ বাবা আদম শহীদ মসজিদ (কাজী কসবা, রামপাল)

১০/ অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান (বজ্রযোগিনী)

১১/ নগর কসবা (মীরকাদিম)

১২/ মীরকাদিম ব্রীজ (মীরকাদিম খাল)

১৩/ নাটেশ্বর বৌদ্ধ বিহার (নাটেশ্বর)

১৪/ স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি (রাড়িখাল)

১৫/ বল্লালবাড়ি (রামপাল)

ফরিদপুর

১/ পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের বাড়ি এবং নতুন জাদুঘর (কবির বাড়ি বা অম্বিকাপুর)

২/ আলীপুর মসজিদ (আলীপুর)

৩/ মথুরাপুর দেউল (মধুখালী)

৪/ সাতৈর জামে মসজিদ (বোয়ালমারী)

৫/ আটরশি (জাকের মঞ্জিল, সদরপুর)

৬/ কানাইপুর জমিদার বাড়ি (কানাইপুর)

৭/ পাতরাইল মসজিদ (ভাঙ্গা)

৮/ দোলমঞ্চ (পুঠিয়া বাজার)

৯/ শিব মন্দির (কাচারিপাড়া)

১০/ গেরদা ফলক (গেরদা)

টাঙ্গাইল

১/ মহেরা জমিদার বাড়ি (নাটিয়াপাড়া)

২/ পীরগাছা রাবার বাগান (মধুপুর)

৩/ যমুনা রিসোর্ট ও বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা সেতু)

৪/ কাদিম হামজানি মসজিদ (কালিহাতি)

৫/ পরীর দালান (শিমলাপাড়া, হেমনগর)

৬/ বাসুলিয়া বিল (বাসাইল)

৭/ পাকুটিয়ার জমিদার বাড়ি (পাকুটিয়া)

৮/ গুপ্ত বৃন্দাবন (ঘাটাইল)

৯/ গয়হাটার মঠ (গয়হাটা, নাগরপুর)

১০/ সাগরদীঘি (ঘাটাইল)

১১/ নবাব মঞ্জিল (ধনবাড়ি)

১২/ করটিয়া জমিদার বাড়ি (করটিয়া)

১৩/ আতিয়া জামে মসজিদ (দেলদুয়ার)

১৪/ মধুপুর জাতীয় উদ্যান (মধুপুর)

১৫/ এলেঙ্গা রিসোর্ট (কালিহাতি)

১৬/ আদম কাশ্মিরীর মাজার (পাথরাইল)

১৭/ নাগরপুর চৌধুরী বাড়ি (নাগরপুর)

গাজীপুর

১/ সাবাহ গার্ডেন রিসোর্ট (বাঘের বাজার)

২/ সোহাগ পল্লী (কালামপুর)

৩/ নক্ষত্রবাড়ি রিসোর্ট (রাজবাড়ি, শ্রীপুর)

৪/ অঙ্গনা রিসোর্ট (সূর্যনারায়ণপুর, কাপাসিয়া)

৫/ বেলাই বিল (কানাইয়া বাজার)

৬/ রাঙামাটি ওয়াটার ফ্রন্ট রিসোর্ট ও বনভোজন কেন্দ্র (চন্দ্রা)

৭/ ছুটি রিসোর্ট (সুকুন্দি গ্রাম, গাজীপুর ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান)

৮/ গাজীপুর ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান (জয়দেবপুর)

৯/ বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক (মাওনা, শ্রীপুর)

১০/ নুহাশ পল্লী (পিরুজ আলী)

১১/ জল জঙ্গলের কাব্য রিসোর্ট (পুবাইল, টংগী)

১২/ স্প্রিং ভ্যালি রিসোর্ট (সালনা)

১৩/ আনসার একাডেমী (সফিপুর)

১৪/ মনপুড়া পার্ক (কাশিমপুর)

১৫/ রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্ট (রাজেন্দ্রপুর)

গোপালগঞ্জ

১/ আড়পাড়া মন্সীবাড়ি (টেকেরহাট)

২/ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈত্রিকবাড়ি (কোটালীপাড়া)

৩/ বঙ্গবন্ধুর সমাধি (টুঙ্গীপাড়া)

৪/ শাপলার বিল (কোটালীপাড়া)

৫/ গিরীশ চন্দ্র সেনের বাড়ি (ভাটিয়াপাড়া)

৬/ উলপুর জমিদার বাড়ি (উলপুর)

৭/ চন্দ্রঘাট (গোপালগঞ্জ সদর)

৮/ সখীচরন রায়ের বাড়ি (ভাটিয়াপাড়া)

৯/ উজানীর রাজবাড়ি (মুকসুদপুর)

১০/ বিল রুট ক্যানেল (আড়পাড়া)

১১/ ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি (ওড়াকান্দি)

কিশোরগঞ্জ

১/ সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক বাড়ি (কটিয়াদী)

২/ জঙ্গলবাড়ি দুর্গ (করিমগঞ্জ)

৩/ এগারোসিন্দুর দুর্গ (পাকুন্দিয়া)

৪/ কবি চন্দ্রাবতী মন্দির (কিশোরগঞ্জ সদর)

৫/ গাঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়ি (হোসেনপুর)

৬/ কুতুবশাহ মসজিদ (অষ্টগ্রাম)

৭/ নিকলী হাওর (নিকলী)

৮/ মিঠামইন হাওর (মিঠামইন)

৯/ অষ্টগ্রাম হাওর (অষ্টগ্রাম)

১০/ ওয়াচ টাওয়ার (কিশোরগঞ্জ সদর)

১১/ ভৈরব সেতু (ভৈরব)

১২/ শোলাকিয়া ইদগাহ মাঠ (কিশোরগঞ্জ সদর)

১৩/ পাগলা মসজিদ (হারুয়া)

১৪/ দিল্লীর আখড়া (মিঠামইন)

মাদারীপুর

১/ শকুনীলেক (মাদারীপুর সদর)

২/ চরমুগুরিয়ার বানর (চরমুগুরিয়া)

৩/ পর্বতের বাগান (মাদারীপুর সদর)

৪/ প্রণব মঠ (বাজিতপুর)

৫/ আউলিয়াপুর নীলকুঠি (মাদারীপুর সদর)

৬/ সেনাপতির দীঘি (কালকিনি)

৭/ ঝাউদি গিরি (মাদারীপুর সদর)

৮/ রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি ও রাজা রাম মন্দির (রাজৈর)

৯/ মিঠাপুর জমিদার বাড়ি (মাদারীপুর সদর)

১০/ খালিয়া শান্তিকেন্দ্র (রাজৈর)

মানিকগঞ্জ

১/ বালিয়াটি জমিদার বাড়ি (সাটুরিয়া)

২/ তেওতা জমিদার বাড়ি (শিবালয়)

৩/ স্বপ্নপুরী পিকনিক স্পট (হরিরামপুর)

৪/ ক্ষণিকা পিকনিক স্পট (মানিকগঞ্জ সদর)

৫/ নাহার গার্ডেন পিকনিক স্পট (সাটুরিয়া)

৬/ আরিচা ঘাট (শিবালয়)

নারায়ণগঞ্জ

১/ মায়াদ্বীপ (বারদী, সোনারগাঁও)

২/ সায়রা গার্ডেন রিসোর্ট (মদনপুর)

৩/ সুবর্ণগ্রাম এমিউসমেন্ট পার্ক ও রিসোর্ট (ভূলতা)

৪/ বারদী লোকনাথ আশ্রম (বারদী, সোনারগাঁও)

৫/ সোনারগাঁও জাদুঘর (সোনারগাঁও)

৬/ মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি (রূপগঞ্জ)

৭/ পানাম নগর (সোনারগাঁও)

৮/ জিন্দা পার্ক (রূপগঞ্জ)

৯/ তাজমহল (সোনারগাঁও)

১০/ চৌদ্দার চর (আড়াইহাজার)

১১/ বন্দর শাহী মসজিদ (কদম রসুল)

১২/ সোনাকান্দা দুর্গ ও হাজীগঞ্জ দুর্গ (হাজীগঞ্জ)

১৩/ সাতগ্রাম জমিদার বাড়ি (পুরিন্দা)

১৪/ বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ি (মদনপুর)

১৫/ পন্ড গার্ডেন পার্ক (রূপগঞ্জ)

১৬/ বিবি মরিয়ম মসজিদ ও সমাধি (হাজীগঞ্জ)

নরসিংদী

১/ লক্ষ্মণ সাহার জমিদার বাড়ি (ডাংগা)

২/ দেওয়ান শরীফ মসজিদ (পলাশ)

৩/ সোনাইমুড়ি টেক (সোনাইমুড়ি)

৪/ উয়ারী বটেশ্বর (বেলাবো)

৫/ গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি (ডাংগা)

৬/ শাহ ইরানি মাজার (বেলাবো)

৭/ আশ্রাবপুর মসজিদ (শিবপুর)

৮/ ড্রিম হলিডে পার্ক (পাঁচদোনা)

৯/ লটকন বাগান (বেলাবো)

১০/ বালাপুর জমিদার বাড়ি (বালাপুর)

১১/ বেলাবো বাজার জামে মসজিদ (বেলাবো)

১২/ মনুমিয়া জমিদার বাড়ি (ঘোড়াশাল)

রাজবাড়ি

১/ কল্যাণ দীঘি (নবাবপুর)

২/ নলিয়া জোড় বাংলা মন্দির (বালিয়াকান্দি)

৩/ মীর মোশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র (বালিয়াকান্দি)

৪/ নীলকুঠি (বালিয়াকান্দি)

৫/ শাহ পালোয়ানের মাজার (বালিয়াকান্দি)

৬/ সমাধিনগর মঠ (বালিয়াকান্দি)

শরীয়তপুর

১/ সুরেশ্বর দরবার শরীফ (নড়িয়া)

২/ বুড়ির হাটের মসজিদ (ভোদরগঞ্জ)

৩/ মানসিংহের বাড়ি (নড়িয়া)

৪/ হাটুরিয়া জমিদার বাড়ি (গোসাইরহাট)

৫/ শিবলিঙ্গ (নড়িয়া)

৬/ ধানুকার মনসা বাড়ি (শরীয়তপুর সদর)

৭/ রাম সাধুর আশ্রম (নড়িয়া)

৮/ রুদ্রকর মঠ (শরীয়তপুর সদর)

৯/ ফতেজজংপুর দুর্গ (নড়িয়া)

১০/ আনন্দবাজার বেড়িবাঁধ (ভেদরগঞ্জ)

সিলেট বিভাগ

সিলেট

১/ খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্ক (খাদিমনগর)

২/ ডিবির হাওর (জৈন্তাপুর)

৩/ লাক্কাতুরা চা বাগান (চৌকিঢেঁকী)

৪/ কুলুমছড়া (গোয়াইনঘাট)

৫/ হযরত শাহ পরাণ (রাঃ) মাজার (খাদিমনগর)

৬/ হযরত শাহজালাল (রাঃ) মাজার (সিলেট সদর)

৭/ মালনীছড়া চা বাগান (সিলেট সদর)

৮/ জাফলং (গোয়ানঘাট)

৯/ সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা (জাফলং)

১০/ রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট (গোয়াইনঘাট)

১১/ লোভাছড়া (কানাইঘাট)

১২/ উৎমাছড়া (কোম্পানীগঞ্জ)

১৩/ লালাখাল (জৈন্তাপুর)

১৪/ ভোলাগঞ্জ

১৫/ পান্থুমাই ঝর্ণা (গোয়াইনঘাট)

১৬/ লক্ষণছড়া (গোয়াইনঘাট)

১৭/ বিছানাকান্দি (গোয়াইনঘাট)

১৮/ মণিপুরী রাজবাড়ি (মির্জাজাঙ্গাল)

১৯/ তামাবিল (গোয়াইনঘাট)

২০/ হাকালুকি হাওর

হবিগঞ্জ

১/ বিথাঙ্গল বড় আখড়া (বানিয়াচং)

২/ সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান (চুনারঘাট)

৩/ রেমা ক্যালেঙ্গা (চুনারঘাট)

৪/ বানিয়াচং গ্রাম

৫/ গ্রীনল্যান্ড পার্ক (চুনারঘাট)

৬/ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্তম্ভ

৬/ মাধবপুর লেক (মাধবপুর)

মৌলভীবাজার

১/ মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক ও ঝর্ণা (মাধবকুণ্ড)

২/ বাইক্কা বিল (শ্রীমঙ্গল)

৩/ হাকালুকি হাওর

৪/ হাইল হাওর

৫/ চা জাদুঘর (শ্রীমঙ্গল)

৬/ মনিপুরী পল্লী (কমলগঞ্জ)

৭/ পরিকুণ্ড জলপ্রপাত (মাধবকুণ্ড)

৮/ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান (কমলগঞ্জ)

৯/ হাম হাম জলপ্রপাত (কমলগঞ্জ)

১০/ দুসাই রিসোর্ট (গিয়াসনগর)

১১/ গ্রান্ড সুলতান টি রিসোর্ট (শ্রীমঙ্গল)

১২/ পাথারিয়া পাহাড় (বড়লেখা)

১৩/ আদমপুর বন (কমলগঞ্জ)

১৪/ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট (শ্রীমঙ্গল)

সুনামগঞ্জ

১/ টাঙ্গুয়ার হাওর (ধর্মপাশা ও তাহিরপুর এলাকাজুড়ে)

২/ নীলাদ্রি লেক (টেকেরঘাট)

৩/ লালঘাট ঝর্ণাধারা (তাহিরপুর)

৪/ শিমুল বাগান (তাহিরপুর)

৫/ নারায়ণতলা

৬/ হাছন রাজা মিউজিয়াম (তেঘরিয়া)

৭/ বারিক্কা টিলা (তাহিরপুর)

৮/ কেয়ারি, লাইমস্টোন লেক (টেকেরঘাট)

৯/ লাউয়ের গড় (তাহিরপুর)

১০/ পাগলা মসজিদ (সুনামগঞ্জ সদর)

১১/ পাইলগাও জমিদার বাড়ি (পাইলগাও)

১২/ গৌরারং জমিদার বাড়ি (সুনামগঞ্জ সদর)

খুলনা বিভাগ

খুলনা

১/ রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি (ফুলতলা)

২/ রূপসা নদী ও রূপসা ব্রীজ

৩/ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৪/ ভৈরব নদী (ফুলবাড়ি)

৫/ জাহানাবাদ পার্ক (জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট)

৬/ এগারো শিব মন্দির (রাজঘাট)

৭/ খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর

৮/ সুন্দরবন

৯/ জাতিসংঘ পার্ক

১০/ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের মাজার

১১/ কটকা সমুদ্র সৈকত

১২/ করমজল পর্যটন কেন্দ্র

১৩/ বনবিলাস চিড়িয়াখানা

১৪/ ধর্ম সভা আর্য মন্দির

১৫/ গল্লামারি বধ্যভূমি শহীদস্মৃতি সৌধ

যশোর

১/ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি (কেশবপুর)

২/ হাজী মুহম্মদ মুহসীনের ইমামবারা (যশোর সদর)

৩/ রাজবাড়ি (যশোর সদর)

৪/ ভরত ভায়না (কেশবপুর)

৫/ চাঁচড়া শিব মন্দির (যশোর সদর)

৬/ ফুলের রাজধানী গদখালী (গদখালী)

৭/ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের সমাধি

৮/ হাম্মাম খানা (মীর্জানগর)

৯/ বিনোদিয়া ফ্যামিলি পার্ক (যশোর সেনানিবাস)

১০/ হনুমান গ্রাম (কেশবপুর)

১১/ পুড়াখালি বাওড় (অভয়নগর)

১২/ ভাটপাড়ার জগন্নাথধাম (অভয়নগর)

১৩/ যশোর কালেক্টরেট ভবন

সাতক্ষীরা

১/ তেঁতুলিয়া জামে মসজিদ (তালা)

২/ মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত (শ্যামনগর)

৩/ জমিদার বাড়ি ও যশোরেশ্বরী মন্দির (শ্যামনগর)

৪/ নলতা রওজা শরীফ (কালিগঞ্জ)

৫/ নীলকুঠি (দেবহাটা)

৬/ লাপসা (সাতক্ষীরা সদর)

৭/ বৌদ্ধ মঠ (কলারোয়া)

৮/ মোজাফফর গার্ডেন, বনলতা বাগান (কালিগঞ্জ)

৯/ সাত্তার মোড়লের স্বপ্নবাড়ি (কালিগঞ্জ)

১০/ কপোতাক্ষ নদ

মেহেরপুর

১/ মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও কমপ্লেক্স (আম্রকানন)

২/ মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ (মুজিবনগর)

৩/ আমদহ গ্রামের স্থাপত্য (মেহেরপুর সদর)

৪/ ভাটপাটা নীলকুঠি (মেহেরপুর সদর)

৫/ আমঝুপি নীলকুঠি (মেহেরপুর সদর)

৬/ বল্লভপুর চার্চ (মুজিবনগর)

৭/ ভবানন্দপুর মন্দির (মেহেরপুর সদর)

৮/ সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির (মেহেরপুর সদর)

নড়াইল

১/ সুলতান কমপ্লেক্স (নড়াইল সদর)

২/ বাধাঘাট (নড়াইল সদর)

৩/ নিরিবিলি পিকনিক স্পট (লোহাগড়া)

৪/ অরুনিমা কান্ট্রিসাইড এন্ড গলফ রিসোর্ট (কালিয়া)

৫/ চিত্রা রিসোর্ট (সীমাখালী)

৬/ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স (মোহাম্মদনগর)

৭/ নীহাররঞ্জন গুপ্তের বাড়ি (লোহাগড়া)

৮/ জোড় বাংলা মন্দির (লোহাগড়া)

৯/ স্বপ্নবিথি পিকনিক স্পট (লোহাগড়া)

চুয়াডাঙ্গা

১/ পুলিশ পার্ক (চুয়াডাঙ্গা সদর)

২/ দত্তনগর কৃষি খামার (মহেশপুর)

৩/ শিশু স্বর্গ (চুয়াডাঙ্গা সদর)

৪/ নাটুদহের আট কবর (জগন্নাথপুর)

৫/ কেরু সুগার মিলস এন্ড ডিস্টিলারি (দামুড়হুদা)

৬/ চুয়াডাঙ্গা বড় মসজিদ

৭/ কাশীপুর জমিদার বাড়ি (জীবননগর)

৮/ দুয়া বাওড় (রায়পুর)

৯/ ঠাকুরপুর জামে মসজিদ (ঠাকুরপুর)

১০/ আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি (আলমডাঙ্গা)

১১/ ডিসি ইকো পার্ক (দামুরহুদা)

১২/ তিয়রবিলা বাদশাহী মসজিদ (তিয়রবিলা)

কুষ্টিয়া

১/ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি (শিলাইদহ)

২/ ফকির লালন সাঁইজির মাজার (কুষ্টিয়া সদর)

৩/ মীর মোশাররফ হোসেনের বাস্তুভিটা (লাহিনীপাড়া)

৪/ শাহী মসজিদ (ঝাউদিয়া)

৫/ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৬/ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (ভেড়ামারা)

৭/ লালন শাহ সেতু (ভেড়ামারা)

৮/ মোহিনী মিল (কুষ্টিয়া সদর)

৯/ রেইনউইক বাঁধ (কুষ্টিয়া সদর)

১০/ টেগর লজ (মিলপাড়া)

১১/ পরিমল থিয়েটার (কুষ্টিয়া সদর)

মাগুরা

১/ রাজা সীতারাম রায়ের প্রাসাদ দুর্গ (মুহম্মদপুর)

২/ কবি কাজী কাদের নেওয়াজ এর বাড়ি (শ্রীপুর)

৩/ বিড়াট রাজার বাড়ি (শ্রীপুর)

৪/ পীর তোয়াজউদ্দিনের মাজার (শ্রীপুর)

৫/ চন্ডীদাস ও রজকিনীর ঐতিহাসিক ঘাট (শালিখা)

৬/ সিদ্ধেশ্বরী মঠ (মাগুরা সদর)

৭/ শ্রীপুর জমিদার বাড়ি (শ্রীপুর)

৮/ কৃষ্ণমন্দির (মুহম্মদপুর)

৯/ ভাতের ভিটা ঢিবি (মাগুরা সদর)

বাগেরহাট

১/ খান জাহান আলীর মাজার (বাগেরহাট সদর)

২/ ষাট গম্বুজ মসজিদ

৩/ খাঞ্জেলী দিঘি

৪/ সিংগাইর মসজিদ

৫/ নয় গম্বুজ মসজিদ

৬/ সাবেকডাঙ্গা পূরাকীর্তি

৭/ জিন্দাপীর মসজিদ

৮/ অযোধ্যা মঠ

৯/ বাগেরহাট জাদুঘর

১০/ দশ গম্বুজ মসজিদ

১১/ করমজল (সুন্দরবন)

১২/ মংলা বন্দর

১৩/ রনবিজয়পুর মসজিদ

১৪/ চুনাখোলা মসজিদ

ঝিনাইদহ

১/ মিয়ার দালান (ঝিনাইদহ সদর)

২/ বারোবাজার

৩/ জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্ক এন্ড রিসোর্ট

৪/ কেপি বসুর বাড়ি

৫/ মিয়ার দালান (সদর)

৬/ ঢোল সমুদ্র দিঘি

৭/ গলাকাটা মসজিদ (তাহেরপুর)

৮/ শৈলকূপা জমিদার বাড়ি (আবাইপুর)

৯/ জোড় বাংলা মসজিদ (বারোবাজার)

১০/ খালিশপুর নীলকুঠি ভবন (কপোতাক্ষ নদ)

১১/ গাজী কালু ও চম্পাবতীর মাজার (বারোবাজার)

১২/ নলডাঙ্গা রাজবাড়ি রিসোর্ট (কালীগঞ্জ)

১৩/ লালন শাহের ভিটা (হরিণাকুণ্ডু)

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

১/ গুটিয়া মসজিদ (বানারীপাড়া)

২/ দুর্গাসাগর দিঘি (বাবুগঞ্জ)

৩/ উলানিয়া জমিদার বাড়ি

৪/ ৩০ গোডাউন

৫/ লাখুটিয়া জমিদার বাড়ি

৬/ কলসকাঠী জমিদার বাড়ি

৭/ শাপলা গ্রাম (সাতলা)

৮/ অক্সফোর্ড মিশন গির্জা (বগুড়া রোড)

৯/ মিয়াবাড়ি জামে মসজিদ (বরিশাল সদর)

১০/ কসবা মসজিদ (গৌরনদী)

১১/ শংকর মঠ (নতুন বাজার)

১২/ বিবির পুকুর পাড় (সদর)

১৩/ কীর্তনখোলা নদী (বরিশাল সদর)

ঝালকাঠি

১/ শিব বাড়ি মন্দির ও ঠাকুর বাড়ি (সদর)

২/ কীর্ত্তিপাশা জমিদার বাড়ি (সদর)

৩/ বেশনাই মল্লিকের দিঘি

৪/ গাবখান সেতু

৫/ সিটি পার্ক

৬/ মিয়াবাড়ি মসজিদ

৭/ শেরে বাংলার নানাবাড়ি

৮/ সাতুরিয়া জমিদার বাড়ি

৯/ গালুয়া পাকা মসজিদ

১০/ ধানসিঁড়ি ইকোপার্ক

১১/ পেয়ারা বাগান ও ভাসমান বাজার (ভিমরুলি)

১২/ সুজাবাদ কেল্লা (সুজাবাদ)

পটুয়াখালী

১/ কানাই বলাই দিঘী

২/ লেবুর চর

৩/ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত

৪/ কুয়াকাটা বৌদ্ধ মন্দির

৫/ সোনারচর

৬/ কুয়াকাটা রাখাইনপল্লী

৭/ মজিদবাড়িয়া মসজিদ

৮/ সীমা বৌদ্ধ বিহার

৯/ পায়রা সমুদ্রবন্দর

১০/ পানি জাদুঘর

১১/ কালাইয়া প্রাচীন মন্দির

১২/ ক্রাব আইল্যান্ড

১৩/ ফাতরার বন

১৫/ শুঁটকি পল্লী

১৬/ কুয়াকাটার কুয়া

১৭/ দয়াময়ী দেবী মন্দির

পিরোজপুর

১/ সারেংকাঠী পিকনিক স্পট

২/ রিভারভিউ ইকোপার্ক

৩/ রায়েরকাঠী জমিদার বাড়ি

৪/ ভাসমান পেয়ারা বাজার (কুড়িয়ানা)

৫/ মমিন মসজিদ (মঠবাড়িয়া)

৬/ পারেড হাট জমিদার বাড়ি

৭/ স্বরুপকাঠীর পেয়ারা বাগান

৮/ আটঘর আমড়া বাগান

৯/ ডিসি পার্ক

১০/ কবি আহসান হাবিব এর বাড়ি

ভোলা

১/ মানিক মিয়া বাড়ি

২/ কুতুবা মিয়া বাড়ি

৩/ দেউলা তালুকদার বাড়ি

৪/ জমিদার কালা রায়ের বাড়ি

৫/ মনপুরা দ্বীপ

৬/ চর কুকরী মুকরী

৭/ ওয়াচ টাওয়ার

৮/ তারুয়া সমুদ্র সৈকত

৯/ ঢাল চর

১০/ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল জাদুঘর (আলীনগর)

১১/ দুদুমিয়ার বাজার

মনপুরা দ্বীপ, ভোলা

বরগুনা

১/ হরিণঘাটা বনাঞ্চল

২/ বিবিচিনি মসজিদ

৩/ লালদিয়ার বন ও সমুদ্র সৈকত

৪/ কুমিরমারার বন

৫/ রাখাইনপল্লী

৬/ তালতলীর বৌদ্ধ মন্দির

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম

১/ আগুনিয়া চা বাগান (উত্তর রাঙ্গুনিয়া)

২/ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা

৩/ সন্দ্বীপ সমুদ্র সৈকত

৪/ কমনওয়েলথ ওয়ার সেমেট্রি

৫/ খানখানাবাদ সমুদ্র সৈকত (বাঁশখালী)

৬/ খিরাম সংরক্ষিত বনাঞ্চল (ফটিকছড়ি)

৭/ চন্দ্রনাথ মন্দির (সীতাকুণ্ড)

৮/ চেরাগী পাহাড়

৯/ চাঁদপুর-বেলগাঁও চা বাগান (বাঁশখালী)

১০/ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

১১/ বাটালী হিল

১২/ পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত

১৩/ পারকি সমুদ্র সৈকত

১৪/ ফয়েজ লেক

১৫/ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৬/ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

১৭/ সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক (সীতাকুণ্ড)

১৮/ বাঁশখালী ইকোপার্ক

১৯/ বৌদ্ধ তীর্থস্থান চক্রশালা (পটিয়া)

২০/ ভাটিয়ারি গল্ফ ক্লাব

২১/ ভূজপুর সংরক্ষিত বনাঞ্চল (ফটিকছড়ি)

২২/ মহামুনি বৌদ্ধ বিহার (রাউজান)

২৩/ মহামায়া লেক (মীরসরাই)

২৪/ রাঙ্গুনিয়া কোদালা চা বাগান

২৫/ লোহাগাড়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

২৬/ কমলদহ ঝর্ণা

২৭/ গুলীয়াখালী সমুদ্র সৈকত (সীতাকুণ্ড)

২৮/ বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত (সীতাকুণ্ড)

২৯/ সুপ্তধারা, সহস্রধারা, সহস্রধারা-২ ঝর্ণা (সীতাকুণ্ড)

৩০/ খৈয়াছড়া ঝর্ণা (মীরসরাই)

৩১/ মেধস মুনির আশ্রম

৩২/ মিনি বাংলাদেশ (কালুরঘাট)

৩৩/ খেজুরতলা বীচ

৩৪/ কুমারীকুণ্ড (সীতাকুণ্ড)

৩৫/ বাওয়াছড়া লেক (মীরসরাই)

৩৬/ সোনাইছড়ি ট্রেইল (মীরসরাই)

৩৭/ চালন্দা গিরিপথ (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

৩৮/ হাজারিখিল অভয়ারণ্য (ফটিকছড়ি)

৩৯/ বায়েজীদ বোস্তামীর মাজার

৪০/ ছাগলকান্দা ঝর্ণা

৪১/ নাপিত্তাছড়া ট্রেইল (মীরসরাই)

রাঙ্গামাটি

১/ কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২/ কাপ্তাই হ্রদ

৩/ ঝুলন্ত সেতু

৪/ শুভলং ঝর্ণা

৫/ হাজাছড়া ঝর্ণা

৬/ পেদা টিং টিং

৭/ টুকটুক ইকো ভিলেজ

৮/ রাইংখ্যং পুকুর

৯/ রাজবন বিহার

১০/ ঐতিহ্যবাহী চাকমা রাজার (রাজবাড়ি)

১১/ চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার,

১২/ সাজেক ভ্যালী

১৩/ ন-কাবা ছড়া ঝর্ণা

১৪/ কাট্টলী বিল

১৫/ তিনটিলা বনবিহার

১৬/ রঙরাং পাহাড়

১৭/ জুরাছড়ি

১৮/ দুমলং পর্বত

১৯/ লংগদু

২০/ কমলক ঝর্ণা (সাজেক)

২১/ মুপ্পোছড়া ঝর্ণা

২২/ ধুপপানি ঝর্ণা (বিলাইছড়ি)

২৩/ রাইখং লেক (বিলাইছড়ি)

২৪/ চাকমা রাজার রাজবাড়ি

২৫/ ওয়াগ্গা চা এস্টেট

২৬/ উপজাতীয় যাদুঘর

বান্দরবান

১/ বুদ্ধ ধাতু জাদি মন্দির

২/ উজানীপাড়ার বিহার

৩/ বম ও ম্রো উপজাতীয়দের গ্রাম

৪/ প্রান্তিক হ্রদ, জীবননগর এবং কিয়াচলং হ্রদ

৫/ মেঘলা

৬/ সাঙ্গু নদী

৭/ তাজিংডং এবং কেওক্রাডং

৮/ বগা লেক

৯/ সাইরু হিল রিসোর্ট

১০/ লামা

১১/ প্রান্তিক লেক

১২/ মারায়ন ডং (আলীকদম)

১৩/ কংদুক বা যোগী হাফং

১৪/ বাকলাই ঝর্ণা

১৫/ আন্ধারমানিক (থানচি)

১৬/ তুক অ/লামোনই/ডামতুয়া ঝর্ণা (আলীকদম)

১৭/ ডিম পাহাড় (থানচি-আলীকদম)

১৮/ ত্লাবং ঝর্ণা/ডাবল ফলস

১৯/ জৎলং/মোদক মুয়াল

২০/ সাকাহাফং পর্বত

২১/ চিংড়ী ঝর্ণা

২২/ সাতভাইখুম

২৩/ আমিয়াখুম

২৪/ মিলনছড়ি

২৫/ চিম্বুক পর্বত

২৬/ শৈল প্রপাত

২৭/ নাফাখুম জলপ্রপাত (থানচি)

২৮/ আলীর সুড়ঙ্গ (আলীকদম)

২৯/ রূপমুহুরী ঝর্ণা (আলীকদম)

৩০/ জাদিপাই ঝর্ণা (জাদিপাই পাড়া)

৩১/ স্বর্ণমন্দির

৩২/ লুং ফের ভা সাইতার ঝর্ণা

৩৩/ পাইন্দু সাইতার/তিনাপ সাইতার (রোয়াংছড়ি)

৩৪/ নীলাচল

৩৫/ নীলগিরি

৩৬/ ঋজুক ঝর্না (থানচি)

৩৭/ তিন্দু

৩৮/ নাইক্ষ্যংছড়ি লেক ও ঝুলন্ত ব্রীজ

খাগড়াছড়ি

১/ হাতি মাথা/হাতিমুড়া (পেরাছড়া)

২/ শান্তিপুর অরণ্য কুটির (পানছড়ি)

৩/ রিসাং ঝর্ণা (মাটিরাঙ্গা)

৪/ তৈদুছড়া ঝর্ণা (দীঘিনালা)

৫/ দেবতার পুকুর

৬/ আলুটিলা গুহা (মাটিরাঙ্গা)

৭/ নিউজিল্যান্ড পাড়া

৮/ মহালছড়ি লেক

৯/ রামগড় লেক ও চাবাগান

১০/ মায়াবিনী লেক

১১/ রামু বৌদ্ধমন্দির

১২/ মানিকছড়ি মং রাজবাড়ি

১৩/ হর্টিকালচার ব্রীজ

১৪/ রাবার ড্যাম (পানছড়ি)

১৫/ অপু ঝর্ণা

১৬/ শতায়ুবর্ষী বটগাছ

১৭/ বিডিআর স্মৃতিসৌধ

কক্সবাজার

১/ রামু বৌদ্ধ বিহার (রামু)

২/ শামলাপুর সমুদ্র সৈকত (বাহারছড়া)

৩/ মারমেইড ইকো রিসোর্ট (পেঁচারদিয়া)

৪/ শাহপরীর দ্বীপ (টেকনাফ)

৫/ সোনাদিয়া দ্বীপ

৬/ কুতুবদিয়া দ্বীপ

৭/ ইনানী বীচ

৮/ ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক

৯/ হিমছড়ি

১০/ ছেড়া দ্বীপ

১১/ সেন্ট মার্টিন

১২/ আদিনাথ মন্দির (মহেশখালী)

১৩/ লাবনী পয়েন্ট

১৪/ কলাতলী পয়েন্ট

১৫/ সুগন্ধা পয়েন্ট

১৬/ বার্মিজ মার্কেট

১৭/ দরিয়ানগর

১৮/ মেরিন ড্রাইভ রোড

ফেনী

১/ শমসের গাজীর বাঁশের কেল্লা রিসোর্ট (ছাগলনাইয়া)

২/ বিজয় সিংহ দীঘি

৩/ মুহুরী প্রজেক্ট বা মুহুরী সেচ প্রকল্প

৪/ শিলুয়ার শীলপাথর

৫/ রাজাঝীর দীঘি

৬/ বিজয়সিংহ দীঘি

৭/ জগন্নাথ কালীমন্দির

৮/ চাঁদগাজী মসজিদ

৯/ দরবেশ পাগলা মিঞাঁর মাজার

১০/ শিলামূর্তির ধ্বংসাবশেষ (ছাগলনাইয়া)

১১/ ফুলগাজীর দোলমন্দির

১২/ জমিদার বাড়ীর সাত মন্দির (ছাগলনাইয়া)

১৩/ চৌধুরী বাড়ী মসজিদ

নোয়াখালী

১/ নিঝুম দ্বীপ

২/ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন স্মৃতি জাদুঘর

৩/ গান্ধী আশ্রম

৪/ বজরা শাহী মসজিদ

৫/ মুসাপুর সী বীচ

৬/ মাইজদী বড় দীঘি

৭/ কমলা রানীর দীঘি

৮/ মনপুরা দ্বীপ

৯/ হাতিয়া

১০/ ভূঞার দিঘী (সেনবাগ)

১১/ লুর্দের রানীর গীর্জা (সোনাপুর)

১২/ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (চর জব্বর)

১৩/ শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের আশ্রম (চৌমুহনী)

লক্ষ্মীপুর

১/ দালালবাজার জমিদার বাড়ি

২/ কামানখোলা জমিদার বাড়ি

৩/ তিতা খাঁ জামে মসজিদ

৪/ জ্বীনের মসজিদ

৫/ খোয়া সাগর দীঘি

৬/ মটকা মসজিদ

৭/ মজু চৌধুরী ঘাট

৮/ মতির হাট ও মেঘনার ভাসমান চর

৯/ লক্ষ্মীধরাপাড়া দিঘী (রামগঞ্জ)

১০/ রামগতির প্যারাবন

১১/ ভাষা সৈনিক কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার স্মৃতিসৌধ

১২/ শ্রীপুর দাস বাড়ী

১৩/ সাইফিয়া দরবার শরীফ

১৪/ তেলিয়ার চর ও চর গজারিয়া

১৫/ বয়ার চরের প্রাকৃতিক দৃশ্য

১৬/ চররুহিতা

১৭/ ডাকাতিয়া নদ

কুমিল্লা

১/ বায়তুল আজগর জামে মসজিদ

২/ নূর মানিকচর জামে মসজিদ

৩/ কবি তীর্থ দৌলতপুর

৪/ ধর্মসাগর দীঘি

৫/ ময়নামতি জাদুঘর

৬/ শালবন বৌদ্ধ বিহার (কোটবাড়ি)

৭/ ময়নামতি ওয়ার সিমেট্রি

৮/ বার্ড

৯/ শাহ সুজা মসজিদ

১০/ উটখাড়া মাজার

১১/ বায়তুল আজগর জামে মসজিদ

১২/ কুমিল্লার জাহাপুর জমিদার বাড়ি

১৩/ গোমতী নদী

১৪/ বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন

১৫/ রূপ সাগর দীঘি

১৬/ লালমাই পাগাড়

১৭/ রানীর কুঠির

১৮/ রূপবান মুড়া

১৯/ ইটাখোলা মুড়া

২০/ কোটিলা মুড়া

২১/ বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১/ ভৈরব রেলওয়ে সেতু

২/ আরাফাইল মসজিদ (সরাইল)

৩/ উলচাপাড়া মসজিদ (সদর)

৪/ ভাদুঘর শাহী মসজিদ (সদর)

৫/ কালভৈরব মন্দির (সদর)

৬/ তিতাস নদীর ব্রীজ

৭/ বাসুদেব মূর্তি (সরাইল)

৮/ ঐতিহাসিক হাতিরপুল (সরাইল)

৯/ খরমপুর মাজার (আখাউড়া)

১০/ কৈলাঘর দূর্গ (কসবা)

১১/ কুল্লাপাথর শহীদ স্মৃতিসৌধ (কসবা)

১২/ বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের কবর (আখাউড়া)

১৩/ সৌধ হিরন্ময়

১৪/ বিদ্যাকুট সতীদাহ মন্দির

১৫/ গঙ্গাসাগর দিঘী

১৬/ কেল্লা শহীদ মাজার

১৭/ মঈনপুর মসজিদ (কসবা)

১৮/ বাঁশী হাতে শিবমূর্তি (নবীনগর)

১৯/ আনন্দময়ী কালীমূর্তি (সরাইল)

২০/ আর্কাইভ মিউজিয়াম

২১/ ফারুকী পার্কের স্মৃতিস্তম্ভ

২২/ ধরন্তী হাওড়

২৩/ হরিপুর জমিদার বাড়ি

চাঁদপুর

১/ শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির (কচুয়া)

২/ মনসা মুড়া (কচুয়া)

৩/ সাহারপারের দিঘী (কচুয়া)

৪/ উজানীতে বেহুলার পাটা (কচুয়া)

৫/ তুলাতলী মঠ (কচুয়া)

৬/ সাহেবগঞ্জ নীল কুঠি (ফরিদগঞ্জ)

৭/ লোহাগড় মঠ (ফরিদগঞ্জ)

৮/ রূপসা জমিদার বাড়ী (ফরিদগঞ্জ)

৯/ হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ (হাজীগঞ্জ)

১০/ বলাখাল জমিদার বাড়ী (হাজীগঞ্জ)

১১/ নাসিরকোর্ট শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সমাধী স্থল (হাজীগঞ্জ)

১২/ মতলব উত্তর নাগরাজাদের বাড়ি, মঠ ও দিঘী (কাশিমপুর)

১৩/ শাহরাস্তি মঠ (শাহরাস্তি)

১৪/ তিন গম্বুজ মসজিদ ও প্রাচীন কবর (ভিঙ্গুলিয়া)

১৫/ পদ্মা-মেঘনার মিলনস্থল

১৬/ কড়ইতলী জমিদার বাড়ি (ফরিদগঞ্জ)

১৭/ অঙ্গীকার

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী

১/ বরেন্দ্র জাদুঘর

২/ পুটিয়া রাজবাড়ী

৩/ নিশিন্দা রাজ্য

৪/ গজমতখালী ব্রীজ

৫/ তুলসি ক্ষেত্র

৬/ হাওয়াখানা

৭/ গোয়ালকান্দি জমিদার বাড়ি

৮/ পুটিয়া মন্দির

৯/ সরমংলা ইকোপার্ক

১০/ সাফিনা পার্ক

১১/ হজরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) এর মাজার

১২/ গজমতখালী ব্রীজ

১৩/ শহীদ কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানা

১৪/ বাঘা মসজিদ

১৫/ টি-গ্রোয়েন ও পদ্মার তীর

১৬/ বড়কুঠি

১৭/ স্মৃতি অম্লান

১৮/ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ

১৯/ পদ্মার চর

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১/ বাবু ডাইং (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর)

২/ মহানন্দা নদী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর)

৩/ ২য় মহানন্দা সেতু (শেখ হাসিনা সেতু)

৪/ ঐতিহাসিক আলী শাহপুর মসজিদ (নাচোল)

৫/ ষাঁড়বুরুজ, গোমস্তাপুর (রহনপুর)

৬/ ছোট সোনা মসজিদ (শিবগঞ্জ)

৭/ দারাসবাড়ি মসজিদ (শিবগঞ্জ)

৮/ দারাস বাড়ি মাদ্রাসা ও চল্লিশঘর (শিবগঞ্জ)

৯/ খঞ্জনদীঘির মসজিদ (শিবগঞ্জ)

১০/ চামচিকা মসজিদ (শিবগঞ্জ)

১১/ তাহখানা কমপ্লেক্স (শিবগঞ্জ)

১২/ তিন গম্বুজ মসজিদ (শিবগঞ্জ)

১৩/ শাহ্ নেয়ামতউল্লাহ (রহঃ) ও তাঁর মাজার (শিবগঞ্জ)

১৪/ কোতোয়ালী দরওয়াজা (শিবগঞ্জ)

১৫/ ধনাইচকের মসজিদ (শিবগঞ্জ)

১৬/ আমবাগান

জয়পুরহাট

১/ বার শিবালয় মন্দির

২/ পাথরঘাটা মাজার

৩/ ভীমের পান্টি

৪/ নন্দাইল দিঘী

৫/ দুয়ারী ঘাট

৬/ শিশু উদ্যান

৭/ আছরাঙ্গা দিঘী

৮/ হিন্দা-কসবা শাহী মসজিদ

৯/ লকমা রাজবাড়ি

১০/ নিমাই পীরের মাজার

১১/ পাগলা দেওয়ান বধ্যভূমি

১২/ গোপীনাথপুর মন্দির

নওগাঁ

১/ পতিসর রবীন্দ্র কাচারিবাড়ি

২/ ডানা পার্ক

৩/ দিব্যক জয়স্তম্ভ

৪/ জগদ্দল বিহার

৫/ বলিহার রাজবাড়ি

৬/ কুসুম্বা মসজিদ

৭/ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

৮/ করোনেশন থিয়েটার

৯/ অনিমেষ লাহিড়ীর বাড়ি

১০/ সাঁওতালপাড়া

১১/ জবাই বিল

১২/ ভীমের পান্টি

১৩/ আলতাদিঘী

১৪/ হলুদ বিহার

১৫/ দুবলহাটি রাজবাড়ি

১৬/ নওগাঁ জেলা পরিষদ পার্ক

১৭/ মাহি সন্তোষ

১৮/ ঠাকুর মান্দা মন্দির

নাটোর

১/ নাটোর রানী ভবানী রাজবাড়ী

২/ দয়ারামপুর রাজবাড়ি

৩/ বনপাড়া লুর্দের রানী মা মারিয়া ধর্মপল্লী

৪/ বোর্ণী মারীয়াবাদ ধর্মপল্লী

৫/ শহীদ সাগর

৬/ চলনবিল

৭/ হালতি বিল

৮/ দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি

৯/ পদ্মার চর

১০/ উত্তরা গণভবন

১১/ চলন বিল জাদুঘর

১২/ বুধপাড়া কালীমন্দির

১৩/ ধরাইল জমিদার বাড়ি

পাবনা

১/ লালন শাহ্ সেতু (ঈশ্বরদী)

২/ হার্ডিঞ্জ ব্রীজ (ঈশ্বরদী)

৩/ পাবনা মানসিক হাসপাতাল

৪/ জোড় বাংলা মন্দির

৫/ আজিম চৌধুরীর জমিদার বাড়ী (দুলাই)

৬/ শাহী মসজিদ (ভাড়ারা)

৭/ শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র ঠাকুরের আশ্রম (হেমায়েতপুর)

৮/ নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস

৯/ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র (ঈশ্বরদী)

১০/ পাবনা সুগার মিলস (ঈশ্বরদী)

১১/ তাড়াশ রাজবাড়ি

১২/ পাগলা দেওয়ান বধ্যভূমি

১৩/ নগরবাড়ী/নটাখোলা ঘাট (বেড়া)

১৪/ জগন্নাথ মন্দির

১৫/ পাকশী

১৬/ কাঞ্চন পার্ক (সুজানগর)

১৭/ খয়রান ব্রীজ (সুজানগর)

১৮/ প্রশান্তি ভুবন বিনোদন পার্ক (জালালপুর)

১৯/ দুবলিয়া মেলা (দুর্গা পুজার সময়)

২০/ বড়াল ব্রীজ

২১/ দীঘিরপিঠা (ফরিদপুর্)

২২/ রাজা রায় বাহাদুরের বাড়ি (ফরিদপুর্)

২৩/ বেরুয়ান জামে মসজিদ (আটঘরিয়া)

২৪/ তাঁতীবন্দ জমিদার বাড়ি

২৫/ দুলাই ও শিতলাই জমিদার বাড়ি

বগুড়া

১/ বাবা আদমের মাজার ও আদমদিঘীর প্রখ্যাত দিঘী

২/ মহাস্থানগড়

৩/ ঐতিহাসিক যোগীর ভবনের মন্দির

৪/ পাঁচপীর মাজার কাহালু

৫/ বেহুলা লক্ষিণদ্বর (গোকুল মেধ)

৬/ বাবুর পুকুরের গণকবর (শাজাহানপুর)

৭/ সান্তাহার সাইলো

৮/ দেওতা খানকা হ্ মাজার শরিফ (নন্দীগ্রাম)

৯/ সাউদিয়া সিটি পার্ক

১০/ সারিয়াকান্দির পানি বন্দর

১১/ পোড়াদহ মেলা

১২/ মনকালীর কুণ্ডধাপ

১৩/ বিহারধাপ (শিবগঞ্জ)

১৪/ পরশুরামের প্রাসাদ

১৫/ খেরুয়া মসজিদ

১৬/ ভীমের জাঙ্গাল

১৭/ ভাসু বিহার

১৮/ গবিন্দ ভিটা ও নওয়াব প্যালেস

১৯/ জয়পীরের মাজার (দুপচাপিয়া)

সিরাজগঞ্জ

১/ বাঘাবাড়ি নদী বন্দর

২/ হার্ড পয়েন্ট

৩/ ছয় আনি পাড়া দুই গম্বুজ মসজিদ

৪/ নবরত্ন মন্দির

৫/ জয়সাগর দিঘী

৬/ শাহজাদপুর মসজিদ

৭/ ইলিয়ট ব্রীজ

৮/ মখদুম শাহের মাজার

৯/ যমুনা বহুমূখী সেতু

১০/ বঙ্গবন্ধু স্কয়ার

১১/ সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাধ

১২/ ইকো পার্ক

১৩/ মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর বাড়ী

১৪/ শিব মন্দির (তারাশ)

১৫/ রবী ঠাকুরের কুঠীবাড়ি

১৬/ নায়িকা সূচিত্রা সেনের জন্মস্থান (সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রাম)

১৭/ আটঘরিয়া জমিদার বাড়ী

১৮/ সান্যাল জমিদার বাড়ীর শিব দুর্গা মন্দির

১৯/ মকিমপুর জমিদার বাড়ীর মন্দির

রংপুর বিভাগ

রংপুর

১/ কারমাইকেল কলেজ

২/ তাজহাট রাজবাড়ী

৩/ ভিন্নজগৎ

৪/ রংপুর চিড়িয়াখানা

৫/ পায়রাবন্দ

৬/ কেরামতিয়া মসজিদ

৭/ স্মারকস্তম্ভ ‘অর্জন’

৮/ ঝাড়বিশলা

৯/ দেবী চৌধুরানীর রাজবাড়ি

১০/ নয় গম্বুজ মসজিদ

১১/ প্রয়াস সেনা বিনোদন পার্ক

১২/ টাউন হল

১৩/ ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায় এর রাজবাড়ী

১৪/ মাহিগঞ্জের কাজিটারী মসজিদ

১৫/ কবি হেয়াত মামুদের সমাধী

দিনাজপুর

১/ দিনাজপুর রাজবাড়ি

২/ চেহেলগাজি মসজিদ ও মাজার

৩/ কান্তজিউর মন্দির

৪/ ঘোড়াঘাট দুর্গ

৫/ সীতাকোট বিহার

৬/ সুরা মসজিদ

৭/ নয়াবাদ মসজিদ

৮/ রামসাগর

৯/ স্বপ্নপুরী

১০/ কালেক্টরেট ভবন

১১/ সার্কিট হাউস ও জুলুমসাগর

১২/ দিনাজপুর ভবন

১৩/ সিংড়া ফরেস্ট

১৪/ হিলি স্থলবন্দর

১৫/ বিরল স্থলবন্দর

১৬/ বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি

১৭/ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৮/ লিচুবাগান

গাইবান্ধা

১/ বর্ধনকুঠি

২/ নলডাঙ্গার জমিদারবাড়ি

৩/ বামনডাঙ্গার জমিদারবাড়ি

৪/ ভরতখালীর কাষ্ঠ কালী

৫/ রাজা বিরাট

৬/ ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার

৭/ পৌরপার্ক

৮/ বালাসী ঘাট

৯/ ড্রীমল্যান্ড পার্ক

১০/ প্রাচীন মাস্তা মসজিদ

১১/ এসকেএস ইন

১২/ শাহ সুলতান গাজী মসজিদ

কুড়িগ্রাম

১/ চান্দামারী মসজিদ

২/ শাহী মসজিদ

৩/ চন্ডীমন্দির

৪/ দোলমঞ্চ মন্দির

৫/ ভেতরবন্দ জমিদারবাড়ি

৬/ পাঙ্গা জমিদারবাড়ি ধ্বংসাবশেষ

৭/ সিন্দুরমতি দীঘি

৮/ চিলমারী বন্দর

৯/ ঘড়িয়ালডাঙ্গা জমিদার বাড়ি

১০/ নাওডাঙ্গা জমিদার বাড়ি

১১/ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক

১২/ বঙ্গ সোনাহাট ব্রিজ

১৩/ মুন্সিবাড়ি

১৪/ ধরলা ব্রিজ

১৫/ কোটেশ্বর শিব মন্দির

১৬/ বেহুলার চর

লালমনিরহাট

১/ তিন বিঘা করিডোর ও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল

২/ তিস্তা ব্যারাজ ও অবসর রেস্ট হাউস

৩/ বুড়িমারী স্থলবন্দর

৪/ শেখ ফজলল করিমের বাড়ি ও কবর

৫/ তুষভান্ডার জমিদারবাড়ি

৬/ কাকিনা জমিদারবাড়ি

৭/ নিদাড়িয়া মসজিদ

৮/ হারানো মসজিদ

৯/ সিন্দুরমতি দীঘি

১০/ কালীবাড়ি মন্দির ও মসজিদ

১১/ বিমানঘাঁটি

১২/ তিস্তা রেলসেতু

১৩/ হালা বটের তল

১৪/ লালমনিরহাট জেলা জাদুঘর

১৫/ দালাইলামা ছড়া সমন্বিত খামার প্রকল্প

নীলফামারী

১/ ধর্মপালের রাজবাড়ি

২/ ময়নামতি দুর্গ

৩/ ভীমের মায়ের চুলা

৪/ হরিশচন্দ্রের পাঠ

৫/ সৈয়দপুরের চিনি মসজিদ

৬/ তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প

৭/ নীলফামারী জাদুঘর

৮/ কুন্দুপুকুর মাজার

৯/ দুন্দিবাড়ী স্লুইসগেট

১০/ বাসার গেট

১১/ স্মৃতি অম্লান

১২/ দহগ্রাম-আংগরপোত

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ

১/ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

২/ মুক্তাগাছার রাজবাড়ী

৩/ আলেকজান্দ্রা ক্যাসল

৪/ শশী লজ

৫/ ময়মনসিংহ জাদুঘর

৬/ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা

৭/ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী

৮/ সার্কিট হাউজ

৯/ সিলভার প্যালেস

১০/ বিপিন পার্ক

১১/ রামগোপালপুর জমিদার বাড়ি

১২/বোটানিক্যাল গার্ডেন

১৩/ ময়মনসিংহ টাউন হল

১৪/ দুর্গাবাড়ী,

১৫/ গৌরীপুর রাজবাড়ী,

১৬/ কেল্লা তাজপুর

১৭/ আলাদিন্স পার্ক

১৮/তেপান্তর সুটিং স্পট

১৯/ কুমির খামার

২০/ গারো পাহাড়

২১/ চীনা মাটির টিলা

২২/ কালুশাহকালশার দিঘী

২৩/ নজরুল স্মৃতিকেন্দ্র

২৪/ শহীদ আব্দুল জব্বার জাদুঘর

২৫/ রাজ রাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস

জামালপুর

১/হযরত শাহ জামাল (রঃ)-এর মাজার - জামালপুর সদর

২/হযরত শাহ কামাল (রঃ)-এর মাজার - দুরমুঠ, মেলান্দহ উপজেলা

৩/গারো পাহাড়ে লাউচাপড়া পাহাড়িকা বিনোদন কেন্দ্র - বকশীগঞ্জ উপজেলা

৪/মুক্তিযুদ্ধে কামালপুর ১১ নং সেক্টর

৫/কামালপুর স্থলবন্দর

৬/বকশীগঞ্জ বাণিজ্যিক কেন্দ্র

৭/বকশীগঞ্জ জুট স্পিনার্স মিল লিঃ ও লেদার মিল লিঃ

৮/ দয়াময়ী মন্দির - জামালপুর সদর

৯/ যমুনা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি - তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী

১০/তরফদার খামারবাড়ী-জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, সরিষাবাড়ী

১১/জিল বাংলা চিনিকল - দেওয়ানগঞ্জ

১২/দীঘির পাড়- দেউর পাড় চন্দ্রা

১৩//ইন্দিরা- উত্তর দেউর পাড় চন্দ্রা

১৪/যমুনা সিটি পার্ক - পোগলদিঘা, সরিষাবাড়ী

১৫/লুইস ভিলেজ রিসোর্ট অ্যান্ড পার্ক-বেলটিয়া, জামালপুর

১৬/বোসপাড়া গ্রামীণ ব্যাংক

১৭/যমুনা জেটি ঘাট -জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, সরিষাবাড়ী

১৮/গুঠাইল বাজার ঘাট, ইসলামপুর উপজেলা

১৯/বাহাদুরাবাদ ঘাট, কুলকান্দি, ইসলামপুর উপজেলা

২০/হাইওয়ে রোড,খরকা বিল,মাদারগঞ্জ উপজেলা

নেত্রকোনা

১/উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী - বিরিশিরি, দুর্গাপুর উপজেলা

২/বিজয়পুরের চিনামাটির পাহাড় - দুর্গাপুর উপজেলা

৩/কমলা রাণীর দিঘী

৪/কমরেড মণি সিংহ-এর স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ও স্মৃতিস্তম্ভ - দুর্গাপুর উপজেলা

৫/কুমুদীনি স্তম্ভ - দুর্গাপুর উপজেলা

৬/সোমেশ্বরী নদী - দুর্গাপুর উপজেলা

৭/ডিঙ্গাপোতা হাওর - মোহনগঞ্জ উপজেলা

৮/চরহাইজদা হাওর

৯/মগড়া নদী - মদন উপজেলা

১০/কংস নদ

১১/নিঝুম পার্ক

শেরপুর

১/কলা বাগান

২/গজনী অবকাশ কেন্দ্র

৩/গড়জরিপা বার দুয়ারী মসজিদ

৪/গোপী নাথ ও অন্ন পূর্ন্না মন্দির

৫/ঘাঘড়া খান বাড়ি জামে মসজিদ

৬/জিকে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

৭/নয়আনী জমিদার বাড়ি

৮/নয়আনী জমিদার বাড়ির রংমহল

৯/নয়াবাড়ির টিলা

১০/পানিহাটা-তারানি পাহাড়

১১/পৌনে তিন আনী জমিদার বাড়ি

১২/বারোমারি গীর্জা ও মরিয়ম নগর গীর্জা

১৩/মধুটিলা ইকোপার্ক

১৪/মাইসাহেবা জামে মসজিদ

১৫/রাজার পাহাড় ও বাবেলাকোনা

১৬/লোকনাথ মন্দির ও রঘুনাথ জিওর মন্দির

১৭/সুতানাল দীঘি

১৮/অলৌকিক গাজির দরগাহ, রুনিগাও, নকলা

১৯/আড়াই আনী জমিদার বাড়ি

২০/কসবা মুঘল মসজিদ

২১/গড়জরিপা কালিদহ গাং এর ডিঙি

২২/গড়জরিপা ফোর্ট (১৪৮৬-৯১ খ্রিস্টাব্দ)

২৩/জরিপ শাহ এর মাজার

২৪/নয়াআনী বাজার নাট মন্দির

২৫/নালিতাবাড়ির বিখ্যাত রাবারড্যাম

২৬/পানি হাটা দিঘী

২৭/মঠ লস্কর বারী মসজিদ (১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ)

২৮/মুন্সি দাদার মাজার, নয়াবাড়ি, বিবিরচর, নকলা

২৯/শাহ কামাল এর মাজার (১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

৩০/শের আলী গাজীর মাজার

তৃতীয় অধ্যায়:

বাংলাদেশের ৬৪ জেলার নামকরণের ইতিহাস

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা জেলা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মোঘল-পূর্ব যুগে কিছু গুরুত্ব ধারন করলেও শহরটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে মোঘল যুগে। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক) একসময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফুডোসা) ছিল।

খ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানের নির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল।

গ) 'ঢাকাভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল।

ঘ) রাজতরঙ্গিণী-তে ঢাক্কা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে অথবা এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।

কথিত আছে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ঐ এলাকায় একটিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাই, রাজা মন্দিরেরনাম ঢাকেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে। আবার অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শহরে 'ঢাক' বাজানোর নির্দেশ দেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্দির রূপ ধারণ করে এবং তা থেকেই এই শহরের নাম ঢাকা হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করে জাহাঙ্গীরনগর।

ফরিদপুর জেলা

ফরিদপুরের নামকরণ করা হয়েছে এখানকার প্রখ্যাত সুফী সাধক শাহ শেখ ফরিদুদ্দিনের নামানুসারে।

মাদারীপুর জেলা

মাদারীপুর জেলা একটি ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাধক হযরত বদরুদ্দিন শাহমাদার (র) এর নামানুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয়। প্রাচীনকালে মাদারীপুরের নাম ছিল ইদিলপুর। ১৯৮৪ সালে মাদারীপুর জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

গোপালগঞ্জ জেলা

গোপালগঞ্জ জেলা শহরের রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস। অতীতের রাজগঞ্জ বাজার আজকের জেলা শহর গোপালগঞ্জ। আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে শহর বলতে যা বুঝায় তার কিছুই এখানে ছিল না। এর পরিচিতি ছিল শুধু একটি ছোট্ট বাজার হিসেবে। এ অঞ্চলটি মাকিমপুর স্টেটের জমিদার রানী রাসমণির এলাকাধীন ছিল। উল্লেখ্য রানী রাসমণি একজন জেলের মেয়ে ছিলেন। সিপাই মিউটিনির সময় তিনি একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন। পরবর্তীতে তারই পুরস্কার হিসাবে বৃটিশ সরকার রাসমণিরকে মাকিমপুর স্টেটের জমিদারী প্রদার করেন এবং তাঁকে রানী উপাধিতে ভূষিত করেন। রানী রাসমণির এক নাতির নাম ছিল নব-গোপাল। তিনি তাঁর স্নেহাস্পদ নাতির নাম এবং পুরানো ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নাতিন নামের ‘গোপাল’ অংশটি প্রথমে রেখে তার সাথে রাজগঞ্জের ‘গঞ্জ’ যোগ করে এ জায়গাটির নতুর নামকরণ করেন গোপালগঞ্জ। ১৯৮৪ সালে ফরিদপুর জেলার মহকুমা থেকেগোপালগঞ্জ জেলা সৃষ্টি হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহকুমার জন্ম হয়। মহকুমার প্রথম প্রশাসক ছিলেন মি. বকসেল। বর্তমান কিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্ভক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও কিশোরগঞ্জ এলাকা 'কাটখালী' নামে পরিচিত ছিল। ইতিহাসবিদদের ধারণা ও জনশ্রুতি মতে এ জেলার জমিদার ব্রজকিশোর মতান্তরে নন্দকিশোর প্রামানিকের 'কিশোর' এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাট বা গঞ্জের 'গঞ্জ'যোগ করে কিশোরগঞ্জ নামকরণ করা হয়।

গাজীপুর জেলা

বিলু কবীরের লেখা ‘বাংলাদেশের জেলা: নামকরণের ইতিহাস’ বই থেকে জানা যায়, মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে জনৈক মুসলিম কুস্তিগির গাজী এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে এ অঞ্চল শাসন করেছিলেন। এ পাহলোয়ান গাজীর নামানুসারেই এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় গাজীপুর বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। আরেকটি জনশ্রুতি এ রকম সম্রাট আকবরের সময় চব্বিশ পরগনার জায়গিরদার ছিলেন ঈশা খাঁ। এই ঈশা খাঁরই একজন অনুসারীর ছেলের নাম ছিল ফজল গাজী। যিনি ছিলেন ভাওয়াল রাজ্যের প্রথম ‘প্রধান’। তারই নাম বা নামের সঙ্গে যুক্ত ‘গাজী’ পদবি থেকে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় গাজীপুর। গাজীপুর নামের আগে এ অঞ্চলের নাম ছিল জয়দেবপুর। এ জয়দেবপুর নামটি কেন হলো, কতদিন থাকল, কখন, কেন সেটা আর থাকল না সেটিও প্রাসঙ্গিক ও জ্ঞাতব্য। ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন জয়দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী। বসবাস করার জন্য এ জয়দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী পীরাবাড়ি গ্রামে একটি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রামটি ছিল চিলাই নদীর দক্ষিণপাড়ে। এ সময় ওই জমিদার নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে এ অঞ্চলটির নাম রাখেন ‘জয়দেবপুর’ এবং এনামই বহাল ছিল মহকুমা হওয়ার আগ পর্যন্ত। যখন জয়দেবপুরকে মহকুমায় উন্নত করা হয়, তখনই এরনাম পাল্টে জয়দেবপুর রাখা হয়। উল্লেখ্য, এখনও অতীতকাতর ঐতিহ্যমুখী স্থানীয়দের অনেকেই জেলাকে ‘জয়দেবপুর’ বলেই উল্লেখ করে থাকেন। গাজীপুর সদরের রেলওয়ে স্টেশনের নাম এখনো ‘জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন’। তবে বিস্তারিত আলোচনায় গেলে বলতেই হয়, গাজীপুরের আগের নাম জয়দেবপুর এবং তারও আগের নাম ভাওয়াল। গাজীপুরকে ১৯৮৪খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ জেলা এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি সোমবার সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়।

মানিকগঞ্জ জেলা

মূলত সংস্কৃত 'মানিক্য' শব্দ থেকে মানিক শব্দটি এসেছে। মানিক হচ্ছে চুনি পদ্মরাগ। গঞ্জ শব্দটি ফরাসী। মানিকগঞ্জের নামের ঋৎপত্তি ইতিহাস আজও রহস্যবৃত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে সুফি দরবেশ মানিক শাহ সিংগাইর উপজেলার মানিক নগরে আসেন এবং খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কারও মতে দূর্ধর্ষ পাঠান সর্দার মানিক ঢালীর নামানুসারে মানিকগঞ্জ নামের উৎপত্তি। আবার কারোমতে, নবাব সিরাজ উদ-দৌলার বিশ্বাসঘাতক মানিক চাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার নমানুসারে ১৮৪৫ সালের মে মাসে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ হয়। মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ সম্পর্কীত উল্লেখ্য তিনটি পৃথক স্থানীয় জনশ্রুতি এবং অনুমান নির্ভর। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি, তবে মানিক শাহের নামানুসারে মানিকগঞ্জ মহকুমার নামকরণ সম্পর্কীত জনশ্রুতি এবং ঘটনা প্রবাহ থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তাই সঠিক বলে ধরা হয়।

মুন্সীগঞ্জ জেলা

মুন্সিগঞ্জে প্রাচীন নাম ছিল ইদ্রাকপুর। মোঘল শাসনামলে এই ইদ্রাকপুর গ্রামে মুন্সী হায়দার হোসেন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোঘল শাসক দ্বারা ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত সজ্জন ও জনহিতৈষী মুন্সী হায়দার হোসেনের নামে ইদ্রাকপুরের নাম হয় মুন্সীগঞ্জ। কারো কারো মতে জমিদার এনায়েত আলীমুন্সীর নামানুসারে মুন্সীগঞ্জে নামকরণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

১৭৬৬ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বিকন লাল পান্ডে(বেণু ঠাকুর বা লক্ষীনায়ায়ণ ঠাকুর) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে এ অঞ্চলের মালিকানা গ্রহণ করে। তিনি প্রভু নারায়ণের সেবার ব্যয়ভার বহনের জন্য একটি উইলের মাধ্যমে শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত মার্কেটকে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। তাই পরবর্তীকালে এ স্থানের নাম হয় নারায়ণগঞ্জ।

নরসিংদী জেলা

কথিত আছে, প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি নরসিংহ নামক একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। আনুমানিক পঞ্চদশশতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা নরসিংহ প্রাচীন ব্যক্ষ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে নরসিংহপুর নামে একটি ছোটনগর স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে নরসিংদী নামটি আবির্ভূত হয়। নরসিংহ নামের সাথে 'দী' যুক্ত হয়ে নরসিংদী হয়েছে। নরসিংহদী শব্দের পরিবর্তিত রূপই "নরসিংদী"।

রাজবাড়ী জেলা

রাজা সূর্য্য কুমারের নামানুসারে রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয়। রাজা সূর্য্য কুমারের পিতামহ প্রভুরাম নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার রাজকর্মী থাকাকালীন কোন কারণে ইংরেজদের বিরাগভাজন হলে পলাশীরযুদ্ধের পর লক্ষীকোলে এসে আত্মগোপন করেন। পরে তাঁর পুত্র দ্বিগেন্দ্র প্রসাদ এ অঞ্চলে জমিদারী গড়ে তোলেন। তাঁরই পুত্র রাজা সূর্য্য কুমার ১৮৮৫ সালে জনহিতকর কাজের জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।১৯৮৪ সালে ১মার্চ জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

শরীয়তপুর জেলা

বৃটিশ বিরোধী তথা ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহর নামানুসারে শরীয়তপুরের নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে ১লা মার্চ শরীয়তপুর জেলা শুভ উদ্বোধন করেন তৎকালীন তথ্য মন্ত্রী জনাব নাজিম উদ্দিন হাসিম।

টাঙ্গাইল জেলা

টাঙ্গাইলের নামকরণ বিষয়ে রয়েছে বহুজনশ্রুতি ও নানা মতামত। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেল তাঁর মানচিত্রে এ সম্পূর্ণ অঞ্চলকেই আটিয়া বলে দেখিয়েছেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে টাঙ্গাইল নামে কোনো স্বতন্ত্র স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইল নামটি পরিচিতি লাভ করে ১৫ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর দপ্তর আটিয়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরের সময় থেকে।

টাঙ্গাইলের ইতিহাস প্রণেতা খন্দকার আব্দুর রহিম সাহেবের মতে, ইংরেজ আমলে এদেশের লোকেরা উঁচু শব্দের পরিবর্তে 'টান' শব্দই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল বেশি। এখনো টাঙ্গাইল অঞ্চলে 'টান' শব্দের প্রচলন আছে। এই টানের সাথে আইল শব্দটি যুক্ত হয়ে হয়েছিল টান আইল। আর সেই টান আইলটি রূপান্তরিত হয়েছে টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলের নামকরণ নিয়ে আরো বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ে নানা মত প্রকাশ করেছেন।কারো কারো মতে, বৃটিশ শাসনামলে মোগল প্রশাসন কেন্দ্র আটিয়াকে আশ্রয় করে যখন এই অঞ্চল জম-জমাট হয়ে উঠে। সে সময়ে ঘোড়ার গাড়িছিল যাতায়াতের একমাত্র বাহন, যাকে বর্তমান টাঙ্গাইলেরস্থানীয় লোকেরা বলত 'টাঙ্গা'। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও এ অঞ্চলের টাঙ্গা গাড়ির চলাচল স্থলপথে সর্বত্র। আল শব্দটির কথা এ প্রসঙ্গে চলে আসে। বর্তমান টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের নামের সাথেএই আল শব্দটির যোগ লক্ষ্য করা যায়। আল শব্দটির অর্থ সম্ভবত সীমা নির্দেশক যার স্থানীয় উচ্চারণআইল। একটি স্থানকে যে সীমানা দিয়ে বাঁধা হয় তাকেই আইল বলা হয়।

টাঙ্গাওয়ালাদের বাসস্থানের সীমানাকে 'টাঙ্গা+আইল' এভাবে যোগ করে হয়েছে 'টাঙ্গাইল' এমতটি অনেকে পোষণ করেন। আইল শব্দটি কৃষি জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই শব্দটি আঞ্চলিক ভাবে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। টাঙ্গাইলের ভূ-প্রকৃতি অনুসারে স্বাভাবিকভাবে এর ভূমি উঁচু এবং ঢালু। স্থানীয়ভাবে যার সমার্থক শব্দ হলো টান। তাই এই ভূমিরূপেরকারণেই এ অঞ্চলকে হয়তো পূর্বে 'টান আইল' বলা হতো। যা পরিবর্তীত হয়ে টাঙ্গাইল হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগ

বান্দরবন জেলা

বান্দরবন জেলার নামকরণ নিয়ে একটি কিংবদন্তি আছে, এলাকার বাসিন্দাদের মুখে প্রচলিত রূপকথায় অত্র এলাকায় এ সময় অসংখ্য বানর বাস করত। আর এই বানরগুলো শহরের প্রবেশ মুখে ছড়ার পাড়ে প্রতিনিয়ত লবণ খেতে আসত। এক সময় অতি বৃষ্টির কারণে ছড়ার পানি বৃদ্ধি পেলে বানরের দল ছড়া পাড় থেকে পাহাড়ে যেতে না পারায় একে অপরকে ধরে সারিবদ্ধভাবে ছড়া পার হয়। বানরের ছড়া পারাপারের এই দৃশ্য দেখতে পায় এই জনপদের মানুষ। এই সময় থেকে জায়গাটি "ম্যাকছি ছড়া" হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মার্মা ভাষায় ম্যাক শব্দটির অর্থ হল বানর আর ছিঃ শব্দটির অর্থ হল বার্ধ। কালের প্রবাহে বাংলা ভাষাভাষির সাধারণ উচ্চারণে এই এলাকার নাম বান্দরবন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে মার্মা ভাষায় বান্দরবনের প্রকৃত নাম "রদ ক্যওচি চিম্রো'।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

১৯৮৪ সালে ব্রাহ্মবাড়িয়া জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে এটি কুমিল্লা জেলার একটি মহকুমাছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নামকরণের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাইনি।

চাঁদপুর জেলা

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র অংকন করেছিলেন, তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণের সিংহপুর নামক (বর্তমানে যা নদীগর্ভে বিলীন) স্থানে চাঁদপুরের অফিস -আদালত ছিল। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল ছিল বতৃমান স্থান থেকে পাওয়া প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। মেঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এ এলাকা বর্তমানে বিলীন। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়ের দখলে ছিল। ঐতিহাসিক জে.এম সেনগুপ্তের মতে চাঁদরায়ের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কথিত আছে চাঁপুরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফকিরের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কারো কারোমতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিল্লী থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদী বন্দরস্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে চাঁদপুর। ১৮৭৮ সালে প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬সালের ১ অক্টোবর চাঁদপুর শহরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

চট্টগ্রাম জেলা

চট্টগ্রামের প্রায় ৪৮ টি নামের খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে রম্যভূমি, চাটিগাঁ, চাতগাও, রোসাং, চিতাগঞ্জ, জাটিগ্রাম ইত্যাদি। চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, পন্ডিত বার্নোলিরমতে, আরবি 'শ্যাত (খন্ড) অর্থ বদ্বীপ, গাঙ্গ অর্থ গঙ্গা নদী থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। অপর এক মতে ত্রয়োদশ শতকে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বার জন আউলিয়া। তাঁরা একটি বড় বাতি বাচেরাগ জ্বালিয়ে উঁচু জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় 'চাটি' অর্থ বাতি বা চেরাগএবং গাঁও অর্থ গ্রাম। এ থেকে নাম হয় "চাটিগাঁও"। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ামজোন্সের মতে, এ এলাকার একটি ক্ষুদ্র পাখির নাম থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম মোঘল সম্রাজের অংশ হয়। আরাকানদের পরাজিত করে মোঘল এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ। ১৭৬০খ্রিস্টাব্দে মীর কাশিম আলী খান ইসলামাবাদকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করেন। পরে কোম্পানি এর নাম রাখেন চিটাগাং।

কুমিল্লা জেলা

প্রাচীনকালে এটি সমতট জনপদের অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তীতে এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হয়। কুমিল্লা নামকরণের অনেকগুলো প্রচলিত। লোককথা আছে, যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াংচোয়াং কর্তৃক সমতট রাজ্য পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত। তাঁর বর্ণনায় কিয়া-মল-ঙ্কিয়া (করধসড়ষড়হশরধ) নামকস্থানের বর্ণনা রয়েছে তা থেকে কমলাঙ্ক বা কুমিল্লার নামকরণ হয়েছে। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা জেলা হিসেবেআত্মপ্রকাশ করে।

কক্সবাজার জেলা

আরব ব্যবসয়ী ও ধর্ম প্রচারকগণ ৮ম শতকে চট্টগ্রাম ও আকিব বন্দরে আগমন করেন। এই দুই বন্দরের মধ্যবর্তী হওয়ায় কক্সবাজার এলাকা আরবদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। নবম শতাব্দীতে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম হরিকেলার রাজা কান্তিদেব দ্বারা শাসিত হয়। ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা সুলাত ইঙ্গচট্টগ্রাম দখল করে নেবার পর থেকে কক্সবাজার আরাকান রাজ্যের অংশ হয়। ১৭৮৪ সালে রার্মারাজ বোধাপায়া আরাকান দখল করে নেয়। ১৭৯৯ সালে বার্মারাজের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রায় ১৩ হাজার আরাকনি কক্সবাজার থেকে পালিয়ে যায়। এদের পূনর্বাসন করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একজন হিরাম কক্সকে নিয়োগ করে। পূনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হবার পূর্বেই হিরাম কক্স মৃত্যুবরণ করেন। পূনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদানের জন্য কক্স-বাজার নামক একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কক্স-বাজার থেকে কক্সবাজার নামের উৎপত্তি।

ফেনী জেলা

ফেনী নদীর নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফেনী। মধ্যযুগে কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ও সাহিত্যে একটি বিশেষ নদীর স্রোদধা ও ফেনী পরাপারের ঘাট হিসেবে আমরা ফনী শব্দটি পাই। ষোড়শ শতাব্দীতে কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগলপুরের বর্ণনায় লিখেছেন, 'ফনী নদীতে বেষ্টিত চারিধার, পূর্বেমহাগিরি পার পাই তার'। সতের শতকে মির্জা নাথানের ফার্সী ভাষায় রচিত 'বাহরিস্থান-ই-গায়েরীতে'ফনী শব্দ ফেনীতে পরিণত হয়। আটারো শতকের ষেষ ভাগে কবি আলী রেজা প্রকাশ কানু ফকির তাঁরপীরের বসতি হাজীগাঁওয়ের অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'ফেনীর দক্ষিণে এক বর উপাম, হাজীগাঁও করিছিল সেই দেশের নাম'। মোহাম্মদ মুকিম তাঁর পৈতৃক বসতির বর্ণনাকালে বলেছেন,"ফেনীর পশ্চিম ভাগে জুগিদিয়া দেশ্। বলাবাহুল্য তাঁরাও নদী অর্থে ফেনী শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় আদি শব্দ 'ফনী' ফেনীতে পরিণত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা

খাগড়াছড়ি একটি নদীর নাম। নদীর পাড়ে খাগড়া বন থাকায় খাগড়াছড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে।

লক্ষ্মীপুর জেল

১৯৮৪ সালে লক্ষ্মীপুর একটি পূর্নাঙ্গ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলার অধীনে ৫ টি উপজেলা, ৩ টিপৌরসভা, ৫৫টি মহল্লা, ৪৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৪৫টি মৌযা এবং ৫৩৬ টি গ্রাম আছে। তবে লক্ষীপুরজেলার নামকরণের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নোয়াখালী জেলা

নোয়াখালী জেলা প্রচীন নাম ছিল ভুলুয়া। নোয়াখালী সদর থানার আদি নাম ছিল সুধারাম।ইতিহাসবিদদের মতে, একবার ত্রিপুরার পাহাড় থেকে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদীর পানিতে ভুলুয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভয়াবহভাবে প্লাবিত হয়ে ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ১৬৬০ সালে একটি বিশাল খাল খনন করা হয়, যা পানি প্রবাহকে ডাকাতিয়া নদী হতে রামগঞ্জ,সোইমুড়ী ও চৌমুহনী হয়ে মেঘনা এবং ফেনী নদীর দিকে প্রবাহিত করে। এই বিশাল খালকে নোয়াখালীর ভাষায় 'নোয়া (নুতুন) খাল' বলা হত এর ফলে 'ভুলুয়া' নামটি পরিবর্তিত হয়ে ১৬৬৮ সালে নোয়াখালী নামে পরিচিতি লাভ করে।

রাঙ্গামাটি জেলা

রাঙামাটি জেলা নামকরণ সম্পর্কে বিলু কবীরের লেখা 'বাংলাদেশ জেলা: নামকরণের ইতিহাস' বই থেকে জানা যায় তা হলো- এই এলাকায় পর্বতরাজি গঠিত হয়েছিল টারশিয়রি যুগে। এই যুগের মাটির প্রধান ব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রঙ লালচে বা রাঙা। এই এলাকার গিরিমৃত্তিকা লাল এবং মাটিও রাঙা বলেই এই জনপদের নাম হয়েছে রাঙামাটি। প্রকৃতি সূচক এই নামকরণটির বিষয়ে অন্য প্রচলিত কথা পরম্পরা হলো- বর্তমান রাঙামাটি জেলা সদরের পূর্বদিকে একটি ছড়া ছিল, যা এখন হ্রদের মধ্যে নিমজ্জিত। এই হ্রদের স্বচ্ছ পানি যখন লাল বা রাঙামাটির উপর দিয়ে ঢাল বেয়ে প্রপাত ঘটাতো, তখনতাকে লাল দেখাতো। তাই এই ছড়ার নাম হয়েছিল 'রাঙামাটি'। এই জেলা সদরের পশ্চিমে আরও একটি ছাড়া ছিল। অনুরূপ কারণে তার নাম দেয়া হয়েছিল 'রাঙাপানি'। এই দুই রাঙা ছড়ার মোহনার বাঁকেই গড়ে উঠেছে বর্তমান জেলা শহর। যা মূলত ছিল অনাবাদী টিলার সমষ্টি এবং বহু উপত্যকার এক নয়নাভিরাম বিস্ময়ভূমি। এই দুটি ছড়া রাঙামাটি ও রাঙাপানি হতে 'রাঙামাটি' জেলার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৮৩ সালে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা গঠন করা হয়।

খুলনা বিভাগ

বাগেরহাট জেলা

সুন্দরবনে বাঘের বাস

দাড়টানা ভৈরব পাশ

সবুজ শ্যামলে ভরা

নদী বাঁকে বসতো যে হাট

তার নাম বাগের হাট।

এক সময় বাগেরহাটের নাম ছিল খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। খানজাহান আলী (রঃ) গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন। কেউ কেউ মনে করেন, বরিশালের শাসক আঘাবাকের এর নামানুসারে বাগেরহাট হয়েছে। কেউবা বলেন, পাঠান জায়গীদার বাকির খাঁ এর নামানুসারে বাগেরহাট হয়েছে। আবার কারো মতে, বাঘ শব্দ হতে বাগেরহাট নাম হয়েছে। জনশ্রুতি আছে খান জাহানআলী (রঃ) এর একটি বাগ(বাগান, ফার্সী শব্দ) বা বাগিচা ছিল। এ বাগ শব্দ হতে বাগেরহাট। কারো মতে,নদীর বাঁকে হাট বসতো বিধায় বাঁকেরহাট। বাঁকেরহাট হতে বাগেরহাট।

চুয়াডাঙ্গা জেলা

চুয়াডাঙ্গার নামকরণ সম্পর্কে কথিত আছে যে, এখানকার মল্লিক বংশের আদিপুরুষ চুঙ্গো মল্লিকের নামে এ জায়গার নাম চুয়াডাঙ্গা হয়েছে। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে চুঙ্গো মল্লিক তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ভারতের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার ইটেবাড়ি- মহারাজপুর গ্রাম থেকে মাথা ভাঙ্গা নদী পথে এখানে এস প্রথম বসতি গড়েন। ১৭৯৭ সালের এক রেকর্ডে এ জায়গার নাম চুঙ্গোডাঙ্গা উল্লেখ রয়েছে। ফারসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় উচ্চারণের বিকৃতির কারণে বর্তমান চুয়াডাঙ্গানামটা এসেছে। চুয়াডাঙ্গা নামকরণের আরো দুটি সম্ভাব্য কারণ প্রচলিত আছে। চুয়া < চয়া চুয়াডাঙ্গা হয়েছে।

যশোর জেলা

১৭৮১ সালে যশোর একটি পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম জেলা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্বাধীন হওয়া জেলাটি যশোর। যশোর, সমতটের একটা প্রাচীন জনপদ। নামটি অতি পুরানো। যশোর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যশোর (জেসিনরে)আরবি শব্দ যার অর্থ সাকো। অনুমান করা হয় কসবা নামটি পীর খানজাহান আলীর দেওয়া (১৩৯৮খৃঃ)। এককালে যশোরের সর্বত্র নদী নালায় পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বে নদী বা খালের উপর সাকো নির্মিত হতো। খানজাহান আলী বাঁশের সাকো নির্মাণ করে ভৈরব নদী পার হয়ে মুড়লীতে আগমন করেন বলে জানা যায়।এই বাঁশের সাকো থেকে যশোর নামের উৎপত্তি। তবে এই মতে সমর্থকদের সংখ্যা খুবই কম। ইরান ও আরব সীমান্তে একটি স্থানের নাম যশোর যার সাথে এই যশোরের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না।খানজাহান আলীর পূর্ব থেকেই এই যশোর নাম ছিল। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতাপদিত্যের পতনের পর চাঁচড়ার রাজাদের যশোরের রাজা বলা হত। কেননা তারা যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের সম্পত্তির একাংশ পুরস্কার স্বরূপ অর্জন করেছিলেন। এই মতও সঠিক বলে মনে হয়। জে, ওয়েস্টল্যাণ্ড তাঁর যশোর প্রতিবেদনের ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের আগে জেলা সদর কসবা মৌজার অর্ন্তভুক্ত ছিল। বনগাঁ-যশোর পিচের রাস্তা ১৮৬৬-১৮৬৮ কালপর্বে তৈরী হয়। যশোর-খুলনা ইতিহাসের ৭৬ পাতায় লেখা আছে "প্রতাপাদিত্যের আগে লিখিত কোন পুস্তকে যশোর লেখা নাই"। সময়ের বিবর্তনে নামের পরিবর্তন স্বাভাবিক।

ঝিনাইদহ জেলা

প্রাচীনকালে বর্তমান ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদীর ধারে ঝিনুক কুড়ানো শ্রমিকের বসতি গড়ে ওঠে বলে জানা যায়। কলকাতা থেকে ব্যবসায়ীরা ঝিনুকের মুক্তা সংগ্রহরের জন্য এখানে ঝিনুক কিনতে আসতো। সে সময় ঝিনুক প্রাপ্তির স্থানটিকে ঝিনুকদহ বলা হত। অনেকের মতে ঝিনুককে আঞ্চলিক ভাষায় ঝিনেই বা ঝিনাই বলে। দহ অর্থ বড় জলাশয়, দহ ফার্সী শব্দ যার অর্ত গ্রাম। সেই অর্থে ঝিনুক দহ বলতে ঝিনুকের জলাশয় অথবা ঝিনুকের গ্রাম। ঝিনুক এবং দহ থেকেই ঝিনুকদহ বা ঝিনেইদহ যা রূপান্তরিত হয়ে আজকের এই ঝিনাইদহ।

খুলনা জেলা

হযরত পীর খানজাহান আলীর (র.) স্মৃতি বিজড়িত ও ভৈরব-রূপসা বিধৌত পৌর শহর খুলনার ইতিহাস নানাভাবে ঐতিহ্য মন্ডিত। খুলনা নামকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচিত মতগুলো হলো : মৌজা 'কিসমত খুলনা' খুলনা খুলনা; ধনপতি সাওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনার নামে নির্মিত 'খুল্লনেশ্বরী কালী মন্দির' থেকে খুলনা; ১৭৬৬ সালে 'ফলমাউথ' জাহাজের নাবিকদের উদ্ধারকৃত রেকর্ডে লিখিত ঈঁষহবধ শব্দ থেকে খুলনা। ইংরেজ আমলের মানচিত্রে লিখিত ঔবংঃড়ৎব-ঈঁষহধ শব্দ থেকে খুলনা,- কোনটি সত্য তা গবেষকরা নির্ধারণ করবেন।

কুষ্টিয়া জেলা

কুষ্টিয়া জেলার নামকরণ নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, কুষ্টিয়ায় এক সময় কোস্টার (পাট) চাষ হত বলে কোস্ট শব্দ থেকে কুষ্টিয়ার উৎপত্তি। হেমিলটনের গেজেটিয়ারে উল্লেখ্য করেন যে, স্থানীয় জনগণ একেকুষ্টি বলে ডাকত। কুষ্টি থেকে কুষ্টিয়া নামকরণ হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ৬ টি থানা নিয়ে কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়।

মাগুরা জেলা

আজকের যেখানে মাগুরা জেলা শহর গড়ে ওঠেছে প্রাচীনকাল থেকেই এর গুরুত্ব অত্যধিক ছিল। কখন থেকে মাগুরা নাম হয়েছে তার সঠিক হিসেব মিলানো কষ্টকর। মাগুরা প্রাচীন আমলের একটি গ্রাম। মাগুরা দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল। মহকুমা সদরের পূর্বে মাগুরা ও পশ্চিমে ছিল দরি মাগুরা। দরি শব্দের অর্থ মাদুরবা সতরঞ্জি। দরি মাগুরায় মাদুর তৈরি সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো বলে নাম হয়েছিল দরি মাগুরা।ধর্মদাস নামে জনৈক মগ আরাকান খেকে এসে আগুরা শহরের পূর্ভ কোণের সোজাসুজি গড়াই নদীর তীরেখুলুমবাড়ি মৌজা প্রভুতি দখল করে। লোকে তাকে মগ জায়গীর বলে আখ্যায়িত করেছিল। অনেকের মতে মগরা থেকে মাগুরা নামের উৎপত্তি। লোক মুখে শোনা যায় এককালে মাগুরা এলাকায় বড় বিল ছিল সেই বিলে পাওয়া যেতো প্রচুর মাগুর মাছ। এই মাগুর মাছের নাম থেকেও মাগুরা নামের উৎপত্তি হতে পারে।মাগুরা নামের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ মাগুরা মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা

মেহেরপুর নামকরণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত দুটি অনুমান ভিত্তিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমটি ইসলাম প্রচারক মরবেশ মেহের আলী নামীয় জনৈক ব্যক্তির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মেহেরপুর রাখা হয়। দ্বিতীয়টি বচনকার মিহির ও তাঁর পুত্রবধু খনা এই শহরে বাস করতেন বলে প্রচলিত আছে। মিহিরের নাম থেকে মিহিরপুর এবং পরবর্তীতে তা মেহেরপুর হয়। ১৯৮৪ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলার মর্যাদালাভ করে।

নড়াইল জেলা

নড়াইল নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকবিদরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিংবদন্তী আছে, নড়িয়াল ফকিরের আশীর্বাদপুষ্ট নড়ি থেকে নড়িয়াল নামের উৎপত্তি। নড়িয়াল ফকিরের আশীর্বাদপুষ্ট তাই নাম হয় নড়িয়াল। পরবর্তীতে লোকমুখে বিকৃত হয়ে নড়িয়াল থেকে নড়াইল।

সাতক্ষীরা জেলা

সাতক্ষীরা জেলার আদি নাম ছিল সাতঘরিয়া। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারী হিসেবে ১৭৭২ সালে নিলামে এই পরগনা কিনে গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র প্রাণনাথ চক্রবর্তী সাতঘর কুলীন ব্রাক্ষ্মণ এনে এই পরগনায় প্রতিষ্ঠিত করেন তা থেকে সাতঘরিয়া নাম হয়।

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া জেলা

১২৮১-১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লরি সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের ২য় পুত্র সুলতান নাসিরউদ্দীন বগরা খানবাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর নামানুসারে বগুড়া জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলা

বৃটিশ শাসনামলে ১৮২১ সালে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চারটি , রংপুর জেলার ২টি ও দিনাজপুর জেলার ৩টি থানা নিয়ে যে বগুড়া জেলা গঠিত হয়েছিল। তারই অংশ নিয়ে ১৯৭১ সালে প্রথমে জয়পুরহাট মহকুমাএবং পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে জয়পুরহাট জেলা গঠিত হয়।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জয়পুরহাটের ইতিহাস বড়ই অস্পষ্ট। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে জয়পুরহাটের কোন স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান ছিল না। জয়পুরহাট দীর্ঘকাল গৌড়ের পাল এবংসেন রাজাদের রাজ্য ভূক্ত ছিল। সে সময় জয়পুরহাট নামে কোন স্থান পাওয়া যায় না । এমনকি জয়পুরহাটের পূর্ব অবস্থান বগুড়ারও কোন ভৌগলিক অস্তিত্ব ছিল না। পূর্বে চাকলা ঘোড়াঘাট এবং পরবর্তীতে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল জয়পুরহাট।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত দেশে ভীষণ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় দেশে রেল লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়। ১৮৮৪ সালে কলকাতা হতে জলপাইগুড়ী পর্যন্ত ২৯৬ মেইল রেলপথ বসানো কাজ শেষহলে লোকজনের উঠানামা ও মালামাল আমদানী রপ্তানির সুবিধার জন্য ৪-৭ মাইল পর পর রেলস্টেশন স্থাপন করা হয়। সান্তাহারের পরে তিলেকপুর, আক্কেলপুর, জামালগঞ্জ এবং বাঘবাড়ীতে স্টেশন স্থাপিত হয়।সে সময় বাঘবাড়ী রেলস্টেশন কে জয়পুর গভর্ণমেন্ট ক্রাউনের নাম অনুসারে রাখা হয় জয়পুরহাট রেলস্টেশন। পরবর্তীতে রেলস্টেশনের সাথে পোস্ট অফিসের নাম জয়পুরহাট রাখার ফলে নামটি প্রসিদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে এর আসল নাম গোপেন্দ্রগঞ্জ বহাল থাকে।

অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দূর্যোগেরও বিপর্যয়ের ফলে যমুনার নব্যতা কমে যায় এবং ভাঙ্গনের ফলে লাল বাজার থানা হুমকির মুখে পরে। ফলে ভারত সরকারের নির্দেশে ১৮৬৮ সালে ১৬ মার্চ তারিখে লালবাজার পুলিশথানা যমুনার অন্য তীরে খাসবাগুড়ী নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় স্থানটির নাম ছিল পাঁচবিবি। পরবর্তী কালে দমদমায় রেলস্টেশন স্থাপিত হলে পুলিশ থানা দমদমায় স্থানান্তরিত হয়। তৎকালেপাঁচবিবি নাম প্রসিদ্ধী লাভ করেছিল। তাই দমদমা রেলস্টেশন ও থানার নাম পূর্বের নাম অনুসারে পাঁচবিবি রেলস্টেশন রাখা হয়। দেশে রেল লাইন বসানোর পূর্বে জলপথে নৌকা এবং স্থলপথে ঘোড়া বাঘোড়ার গাড়ী ছিল যাতায়াতে একমাত্র অবলম্বন । শ্বাপদ সংকুল জলপথে নৌকায় চরে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না।আর এতে অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। তাই রেল লাইন বসানোর পরে নদীপথে যাতায়াত বহুলাংশে কমে যায়। জয়পুরহাট রেলস্টেশন হওয়াতে ব্যবসার ও যাতায়াতের সুবিধার কথা চিন্তা করে বিত্তশালী ব্যাক্তিরা রেলস্টেশনের আশে বাসে বসতি গড়ে তোলেন। এতে খনজনপুর ও লাল বাজার হাটবিলুপ্ত হয়ে যায় । এবং বাঘাবাড়ী অর্থাৎ জয়পুরহাট প্রসিদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীতে বাঘাবাড়ী কে লিখিত হিসেবে গোপেন্দ্রগঞ্জ লিখা হতে থাকে।

১৯০৭ সালে বাঘাবাড়ী তে একটি পৃথক থানা ঘঠিত হয়, এবং জয়পুরহাট নামটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হওয়ায় তা জয়পুরহাট থানা নামে পরিচিতি পায়। ১৯১৮ সালে জয়পুরহাট থানা ভবন নির্মিত হলে পাঁচবিবি থানাকে জয়পুরহাট থানার উত্তর সীমা রূপে নির্দিষ্ট করা হয়।১৯২০ সালে ভূমি জরিপে জয়পুরহাট থানার একটি পৃথক নকশা অংকিত হয়। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অমবর/জয়পুর হতে পাচ মাইল দূরে অমবরের অধিষ্ঠাদেবী শীতলাদেবী । এই দেবী যশোহরের বারোভুঁইয়ার অন্যতম। চাদারায় ও কেদারা রায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানসিংহ কর্তৃকচাদারায় পরাজিত হলে তিনি এই অষ্টভুজাদ দেবীমুর্তি আনয়ন করে স্থাপন করেন। এই সব কারনে জয়পুরবংগবাসীর নিকট প্রিয় হতে থাকে। বিশেষ করে জয়পুর ও মাড়োয়া রাজ্যের বহু লোক জয়পুরহাট এলাকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করায় জয়পুরের সাথে জয়পুরহাট এর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং তাদেরপূর্বের বাসস্থানের সংগে সংগতি রেখে খঞ্জনপুর নীল কুঠির এলাকা জয়পুর অভিহিত হতে থাকে।

পরবর্তীতে রাজস্থানের জয়পুরের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য পোস্ট অফিস ও রেলস্টেশনের নাম রাখা হয়েছিল জয়পুরহাট রেলস্টেশন ও জয়পুরহাট পোস্ট অফিস। ১৯৭১ সালে ১লা জানুয়ারী তারিখে জয়পুরহাট মহকুমার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে জয়পুরহাটকে জেলা ঘোষণা করা হয়।

নওগাঁ জেলা

নওগাঁ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ‘নও’(নুতুন) ও ‘গাঁ (গ্রাম) শব্দ থেকে শব্দ দুটি ফরাসী। নওগাঁ শব্দের অর্থ হল নুতুন গ্রাম। ১৯৮৪ সালে ১ মার্চ নওগাঁ ১১ টি উপজেলা নিয়ে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নাটোর জেলা

নাটোর জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নারদ নদী কথিত আছে এই নদীর নাম থেকেই 'নাটোর' শব্দটির উৎপত্তি। ভাষা গবেষকদের মতে নাতোর হচ্ছে মুল শব্দ। উচ্চারণগত কারণে নাটোর হয়েছে। নাটোর অঞ্চল নিম্নমুখী হওয়ায় চলাচল করা ছিল প্রায় অসম্ভব। জনপদটির দুর্গমতা বোঝাতে বলা হত নাতোর।নাতোর অর্থ দুর্গম। আরেকটি জনশ্রুতি আছে জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার আমোদ-প্রমোদের জন্য গড়েউঠেছিল বাইজিবাড়ি, নটিপাড়া জাতীয় সংস্কৃতি। এই নটি পাড়া থেকে নাটোর শব্দটির উৎপদ্দি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৮৪ সালে নাটোর পূর্ণাঙ্গ জেলা লাভ করে।

নবাবগঞ্জ জেলা

‘চাপাইনবাবগঞ্জ’ নামটি সাম্প্রতিকালের।এই এলাকা ‘নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। চাঁপাইগঞ্জ নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চল ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিহারভূমি এবং এর অবস্থান ছিল বর্তমান সদর উপজেলার দাউদপুর মৌজায়। নবাবরা তাঁদের পাত্র-মিত্র ও পরিষদ নিয়ে এখানে শিকার করতে আসতেন বলে এ স্থানের নাম হয় নবাবগঞ্জ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামের ইতিবৃত্ত নবাব আমলে মহেশপুর গ্রামে চম্পাবতী মতান্তরে ‘চম্পারানী বা চম্পাবাঈ’ নামে এক সুন্দরী বাঈজী বাসকরতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশেপাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নবাবের প্রিয়পাত্রী হয়েওঠেন। তাঁর নামানুসারে এই জায়গার নাম ‘চাঁপাই”। এ অঞ্চলে রাজা লখিন্দরের বাসভূমি ছিল। লখিন্দরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পক। চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর(১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি) ‘বাঙলা সাহিত্যের কথা’ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বর্ণিত লাউসেনের শত্রুরা জামুতিনগর দিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করে। বর্তমান ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া পূর্বে জামুতিনগর নামে পরিচিত ছিল। এ সবের ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো গবেষক চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলে স্থির করেছেন এবং মত দিয়েছেন যে, চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই নামের উৎপত্তি।

পাবনা জেলা

‘পাবনা’ নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তির অন্ত নেই। এক কিংবদন্তি মতে গঙ্গার ‘পাবনী’ নামক পূর্বগামিনী ধারা হতে পাবনা নামের উৎপত্তি হয়েছে। অপর একটি সূত্রে জানা যায় ‘পাবন’ বা ‘পাবনা’ নামের একজন দস্যুর আড্ডাস্থলই এক সময় পাবনা নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন, ‘পাবনা’ নাম এসেছে ‘পদুম্বা’ থেকে। কালক্রমে পদুম্বাই স্বরসঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে বা শব্দগত অন্য ব্যুৎপত্তি হয়ে পাবনা হয়েছে। ‘পদুম্বা’ জনপদের প্রথম সাক্ষাৎ মিলে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে পাল নৃপতি রামপালের শাসনকালে।

রাজশাহী জেলা

এই জেলার নামকরণ নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মতে রাজশাহী রাণী ভবানীর দেয়া নাম। অবশ্য মি. গ্রান্ট লিখেছেন যে, রাণী ভবানীর জমিদারীকেই রাজশাহী বলা হতো এবং এই চাকলার বন্দোবস্তের কালে রাজশাহী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মার উত্তরাঞ্চল বিস্তীর্ন এলাকা নিয়ে পাবনা পেরিয়ে ঢাকা পর্যন্ত এমনকি নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, বীরভূম নিয়ে এই এলাকা রাজশাহী চাকলা নামে অভিহিত হয়। অনুমান করা হয় 'রামপুর' এবং 'বোয়ালিয়া' নামক দু'টি গ্রামের সমন্বয়ে রাজশাহী শহর গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে 'রামপুর-বোয়ালিয়া' নামে অভিহিত হলেও পরবর্তীতে রাজশাহী নামটিই সর্ব সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে আমরা যে রাজশাহী শহরের সঙ্গে পরিচিত, তার আরম্ভ ১৮২৫ সাল থেকে। রামপুর-বোয়ালিয়া শহরের নামকরণ রাজশাহী কী করে হলো তা নিয়ে বহু মতামত রয়েছে। রাজাশাহী শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি ভিন্ন ভাষার একই অর্থবোধক দুটি শব্দের সংযোজন পরিলতি হয়। সংস্কৃত 'রাজ' ও ফারসি 'শাহ' এর বিশেষণ 'শাহী'শব্দযোগে 'রাজশাহী' শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ একই অর্থাৎ রাজা বা রাজা-রাজকীয় বা বা বাদশাহ বা বাদশাহী। তবে বাংলা ভাষায় আমরা একই অর্থের অনেক শব্দ দু-বার উচ্চারণ করে থাকি। যেমন শাক-সবজি, চালাক-চতুর, ভুল-ভ্রান্তি, ভুল-ত্র"টি, চাষ-আবাদ, জমি-জিরাত, ধার-দেনা, শিক্ষা-দীক্ষা, দীন-দুঃখী,ঘষা-মাজা, মান-সম্মান, দান-খয়রাত, পাহাড়-পর্বত, পাকা-পোক্ত, বিপদ-আপদ ইত্যাদি। ঠিক তেমনি করে অদ্ভূত ধরনের এই রাজশাহী শব্দের উদ্ভবও যে এভাবে ঘটে থাকতে পারে তা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। এই নামকরণ নিয়ে অনেক কল্পকাহিনীও রয়েছে।

সাধারণভাবে বলা হয় এই জেলায় বহু রাজা-জমিদারের বসবাস, এজন্য এ জেলার নাম হয়েছে রাজশাহী। কেউ বলেন রাজা গণেশের সময়(১৪১৪-১৪১৮) রাজশাহী নামের উদ্ভব। ১৯৮৪ সালে রাজশাহীর ৪টি মহকুমাকে নিয়ে রাজশাহী, নওগাঁ,নাটোর এবং নবাবগঞ্জ- এই চারটি স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত করা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলা

বেলকুচি থানায় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক এক ভূস্বামী (জমিদার) ছিলেন। তিনি তাঁর নিজ মহালে একটি'গঞ্জ' স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ। কিন্তু এটা ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। যমুনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ক্রমে তা নদীগর্ভে বিলীন হয় এবং ক্রমশ উত্তর দিকে সরে আসে। সেস ময় সিরাজউদ্দীন চৌধুরী ১৮০৯ সালের দিকে খয়রাতি মহল রূপে জমিদারী সেরেস্তায় লিখিত ভুতের দিয়ার মৌজা নিলামে খরিদ করেন। তিনি এই স্থানটিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান স্থানরূপে বিশেষ সহায়ক মনে করেন। এমন সময় তাঁর নামে নামকরণকৃত সিরাজগঞ্জ স্থানটি পুনঃ নদীভাঙ্গণে বিলীণ হয়। তিনি ভুতের দিয়ার মৌজাকেই নতুনভাবে 'সিরাজগঞ্জ' নামে নামকরণ করেন। ফলে ভুতের দিয়ার মৌজাই'সিরাজগঞ্জ' নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে।

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা জেলা

বরগুনা নামের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও জানা যায় যে, উত্তরাঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে কাঠ নিতে এস খরস্রোতা খাকদোন নদী অতিক্রম করতে গিয়ে অনুকুল প্রবাহ বা বড় গোনের জন্য এখানে অপেক্ষা করত বলে এ স্থানের নাম হয় বড় গোনা ।কারো মতে আবার স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি)টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ স্থানের নাম বরগুনা। কেউ কেউ বলেন, বরগুনা নামক কোন প্রভাবশালী রাখাইন অধিবাসীর নামানুসারে বরগুনা। আবার কারো মতে বরগুনা নামক কোন একবাওয়ালীর নামানুসারে এ স্থানের নাম করণ করা হয় বরগুনা।

বরিশাল জেলা

বরিশাল নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। এক কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, পূর্বে এখানে খুব বড় বড় শাল গাছ জন্মাতো, আর এই বড় শাল গাছের কারণে (বড়+শাল) বরিশাল নামের উৎপত্তি। কেউ কেউ দাবি করেন, পর্তুগীজ বেরি ও শেলির প্রেম-কাহিনীর জন্য বরিশাল নামকরণ করা হয়েছে। অন্য এক কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, গিরদে বন্দরে (গ্রেট বন্দর) ঢাকা নবাবদের বড় বড় লবণের গোলা ওচৌকি ছিল। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা বড় বড় লবণের চৌকিকে 'বরিসল্ট' বলতো। অথাৎ বরি (বড়)+সল্ট(লবণ)= বরিসল্ট। আবার অনেকের ধারণা এখানকার লবণের দানাগুলো বড় বড় ছিল বলে 'বরিসল্ট'বলা হতো । পরবর্তিতে বরিসল্ট শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভোলা জেলা

ভোলা জেলার নামকরণের পিছনে স্থায়ীভাবে একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে যে, ভোলা শহরের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া বেতুয়া নামক খালটি এখনকার মত অপ্রশস্ত ছিল না। এক সময় এটি পরিচিত ছিল বেতুয়ানদী নামে। খেয়া নৌকার সাহায্যে নদীতে পারাপার করা হত। বুড়ো এক মাঝি এখানে খেয়া নৌকার সাহায্যে লোকজন পারাপার করতো। তাঁর নাম ছিল ভোলা গাজী পাটনী। বর্তমানে যোগীরঘোলের কাছেই তাঁর আস্তানা ছিল। এই ভোলা গাজীর নামানুসারেই এক সময় স্থানটির নাম দেয়া হয় ভোলা। সেই থেকে আজ অব্দি ভোলা নামে পরিচিত।

ঝালকাঠি জেলা

জেলার নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ জেলার জেলে সম্প্রদায়ের ইতিহাস। মধ্যযুগ-পরবর্তী সময়ে সন্ধ্যা, সুগন্ধা, ধানসিঁড়ি আর বিষখালী নদীর তীরবর্তী এলাকায় জেলেরা বসতি স্থাপন করে। এর প্রাচীননাম ছিল 'মহারাজগঞ্জ'। মহারাজগঞ্জের ভূ-স্বামী শ্রী কৈলাশ চন্দ্র জমিদারি বৈঠক সম্পাদন করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি এ স্থানটিতে এক গঞ্জ বা বাজার নির্মাণ করেন। এ গঞ্জে জেলেরা জালের কাঠি বিক্রি করত। এ জালের কাঠি থেকে পর্যায়ক্রমে ঝালকাঠি নামকরণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়। জানা যায়,বিভিন্ন স্থান থেকে জেলেরা এখানে মাছ শিকারের জন্য আসত এবং যাযাবরের মতো সুগন্ধা নদীর তীরে বাস করত। এ অঞ্চলের জেলেদের পেশাগত পরিচিতিকে বলা হতো 'ঝালো'। এরপর জেলেরা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এভাবেই জেলে থেকে ঝালো এবং জঙ্গল কেটে বসতিগড়ে তোলার কারণে কাটি শব্দের প্রচলন হয়ে ঝালকাটি শব্দের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে ঝালকাটিরূপান্তরিত হয় ঝালকাঠিতে।১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঝালকাঠি পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ করে।

পটুয়াখালী জেলা

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে জানা যায যে, পটুয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভক্ত ছিল। পটুয়াখালী নামকরণের পিছনে প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের লুন।টন অত্যাচারের ইতিহাস জড়িত আছে বলে জানা যায়। পটুয়াখালী শহরের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত নদীটি পূর্বে ভরনী খাল নামে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা এই খালের পথ দিয়ে এস সন্নিহিত এলাকায় নির্বিচারে অত্যাচারহত্যা লুণ্ঠন চালাত। স্থানীয় লোকেরা এই হানাদারদের 'নটুয়া' বলত এবং তখন থেকে খালটি নটুয়ার খালনামে ডাকা হয়। কথিত আছে, এই "নটুয়ার খাল" খাল থেকে পরবর্তীতে এ এলাকার নামকরণ হয়পটুয়াখালী।

পিরোজপুর জেলা

“ফিরোজ শাহের আমল থেকে ভাটির দেশের ফিরোজপুর, বেনিয়া চক্রের ছোয়া লেগে পাল্টে হলোপিরোজপুর”

এ কথা থেকে পিরোজপুর নামকরণের একটা সূত্র পাওয়া যায়। নাজিরপুর উপজেলার শাখারী কাঠির জনৈক হেলাল উদ্দীন মোঘল নিজেকে মোঘল বংশের শেয় বংশধর হিসেবে দাবি করেছিলেন বলে জানা যায়। বাংলার সুবেদার শাহ সুজা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার নিকট পরাজিত হয়ে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে এসে আত্মগোপন করেন। এক পর্যায়ে নলছিটি উপজেলার সুগন্ধা নদীর পাড়ে একটি কেল্লা তৈরি করে কিছুকাল অবস্থান করেন। মীর জুমলার বাহিনী এখানেও হানা দেয়, শাহ সুজা তাঁর দুই কন্যাসহ আরাকান রাজ্যে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি অপর এক রাজার চক্রান্তে নিহত হন। পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও এক শিশুপ্রত্র রেখে যান। পরবর্তীতে তারা অবস্থান পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলে আসে এবং বর্তমান পিরোজপুরের পাশ্ববর্তী দামোদর নদীর মুখে আস্তানা তৈরি করেন। এ শিশুর নাম ছিল ফিরোজ এবং তাঁর নামানুসারে হয় ফিরোজপুর। কালের বিবর্তনে ফিরোজপুরের নাম হয় ‘পিরোজপুর’।পিরোজপুর ১৯৫৯ সালের ২৮ অক্টোবর পিরোজপুর মহকুমা এবং পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে জেলাররূপান্তরিত হয়।

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর জেলা

জনশ্রুতি আছে জনৈক দিনাজ অথবা দিনারাজ দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারেই রাজবাড়ীতে অবস্থিত মৌজার নাম হয় দিনাজপুর। পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসকরা ঘোড়াঘাট সরকার বাতিলকরে নতুন জেলা গঠন করে এবং রাজার সম্মানে জেলার নামকরণ করে দিনাজপুর।

গাইবান্ধা জেলা

গাইবান্ধা নামকরণ সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছ, প্রায় পাচ হাজার বছর আগে মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের রাজধানী ছিল গাইবান্ধার গোবিন্দগজ থানা এলাকায়। বিরাট রাজার গো-ধনের কোন তুলনা ছিল না। তার গাভীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। মাঝে মাঝে ডাকাতরা এসে বিরাট রাজার গাভী লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো। সে জন্য বিরাট রাজা একটি বিশাল পতিত প্রান্তরে গো-শালা স্থাপন করেন। গো-শালাটি সুরক্ষিত এবং গাভীর খাদ্য ও পানির সংস্থান নিশ্চিত করতে। নদী তীরবর্তী ঘেসো জমিতে স্থাপন করা হয়। সেই নির্দিষ্ট স্থানে গাভীগুলোকে বেঁধে রাখা হতো। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে এই গাভী বেঁধে রাখার স্থান থেকে এতদঞ্চলের কথ্য ভাষা অনুসারে এলাকার নাম হয়েছে গাইবাঁধা এবং কালক্রমে তা গাইবান্ধানামে পরিচিতি লাভ করে।

কুড়িগ্রাম জেলা

কুড়িগ্রাম জনপদ বেশ প্রাচীন। কুড়িগ্রাম-এর নাম করণের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন গণনা সংখ্যা কুড়ি থেকে কুড়িগ্রাম হয়েছে। কারো মতে কুড়িটি কলু পরিবার এর আদি বাসিন্দা ছিল। তাই এর নাম কুড়িগ্রাম। কেউ বা মনে করেন, রংগপুর রাজার অবকাশ যাপনের স্থান ছিল কুড়িগ্রাম। প্রচুর বন-জঙ্গল ও ফল মূলে পরিপূর্ণ ছিল এই এলাকা, তাই ফুলের কুড়ি থেকে এর নাম হয়েছে কুড়িগ্রাম।

লালমনিরহাট জেলা

লালমনিরহাট নামকরণ নিয়ে জনশ্রুতি আছে যে, বৃটিশ সরকারের আমলে বর্তমান লালমনিরহাট শহরের মধ্যে দিয়ে রেলপথ বসানোর সময় উল্লিখিত অঞ্চলের রেল শ্রমিকরা বন-জঙ্গল কাটতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তি 'লালমণি' পেয়েছিলেন। সেই লালমণি থেকেই পর্যায়ক্রমে লালমনিরহাট নামের উৎপত্তি হয়েছে। অন্য একসূত্র থেকে জানা যায়, বিপ্লবী কৃষক নেতা নুরুলদীনের ঘনিষ্ঠ সাথী লালমনি নামে এক ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। যার নামানুসারে লালমনিরহাট নামকরণ করা হয়েছে।

নীলফামারী জেলা

প্রায় দুই শতাধিক বছর পূর্বে এ অঞ্চলে নীল চাষের খামার স্থাপন করে ইংরেজ নীলকরেরা। এ অঞ্চলের উর্বর ভূমি নীল চাষের অনুকূল হওয়ায় দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় নীলফামারীতে বেশি সংখ্যায় নীলকুঠি ও নীল খামার গড়ে ওঠে। ঊণবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দুরাকুটি, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ, টেঙ্গনমারীপ্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। সে সময় বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মধ্যে নীলফামারীতেই বেশি পরিমাণেশস্য উৎপাদিত মাটির ঊর্বরতার কারণে। সে কারণেই নীলকরদের ব্যাপক আগমন ঘটে এতদ অঞ্চলে।গড়ে ওঠে অসংখ্য নীল খামার। বর্তমান নীলফামারী শহরের তিন কিলোমিটার উত্তরে পুরাতন রেলস্টেশনের কাছেই ছিল একটি বড় নীলকুঠি। তাছাড়া বর্তমানে অফিসার্স ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত পুরাতন বাড়িটি ছিল একটি নীলকুঠি। ধারণা করা হয়, স্থানীয় কৃষকদের মুখে 'নীল খামার' রূপান্তরিত হয় 'নীলখামারী'তে। আর এই নীলখামারীর অপভ্রংশ হিসেবে উদ্ভব হয় নীলফামারী নামের।

পঞ্চগড় জেলা

“পঞ্চ” (পাঁচ) গড়ের সমাহার “পঞ্চগড়” নামটির অপভ্রমংশ “পঁচাগড়” দীর্ঘকাল এই জনপদে প্রচলিত ছিল ।কিন্তু গোড়াতে এই অঞ্চলের নাম যে, ‘পঞ্চগড়ই’ ছিলো সে ব্যাপারে সন্দেহর কোন অবকাশ নেই। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশে “পঞ্চ” শব্দটি বিভিন্ন স্থান নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন- পঞ্চনদ, পঞ্চবটী,পঞ্চনগরী, পঞ্চগৌড় ইত্যাদি। “পঞ্চনগরীর” দূরত্ব পঞ্চগড় অঞ্চল থেকে বেশি দূরে নয়। পঞ্চগড় জেলায় বেশকিছু গড় রয়েছে তাদের মাঝে উল্লেখ করার মত গড় হল ভিতরগড়, মিরগড়, রাজনগড়, হোসেনগড়,দেবনগড়। ‘পঞ্চ’ অর্থ পাঁচ, আর ‘গড়’ অর্থ বন বা জঙ্গল। ‘পঞ্চগড়’ নামটি এভাবেই এসেছে।

রংপুর জেলা

রংপুর নামকরণের ক্ষেত্রে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে পূর্বের ‘রঙ্গপুর’ থেকেই কালক্রমে এই নামটি এসেছে।ইতিহাস থেকে জানা যায় যে উপমহাদেশে ইংরেজরা নীলের চাষ শুরু করে। এই অঞ্চলে মাটি উর্বর হবার কারণে এখানে প্রচুর নীলের চাষ হত। সেই নীলকে স্থানীয় লোকজন রঙ্গ নামেই জানত। কালের বিবর্তনে সেই রঙ্গ থেকে রঙ্গপুর এবং তা থেকেই আজকের রংপুর। অপর একটি প্রচলিত ধারনা থেকে জানা যায় যেরংপুর জেলার পূর্বনাম রঙ্গপুর। প্রাগ জ্যোতিস্বর নরের পুত্র ভগদত্তের রঙ্গমহল এর নামকরন থেকে এইরঙ্গপুর নামটি আসে। রংপুর জেলার অপর নাম জঙ্গপুর । ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব থাকায় কেউ কেউ এই জেলাকে যমপুর বলেও ডাকত। তবে রংপুর জেলা সুদুর অতীত থেকে আন্দোলন প্রতিরোধের মূল ঘাঁটি ছিল। তাই জঙ্গপুর নামকেই রংপুরের আদি নাম হিসেবে ধরা হয়। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, পুর অর্থ নগর বা শহর।গ্রাম থেকে আগত মানুষ প্রায়ই ইংরেজদের অত্যাচারে নিহত হত বা ম্যালেরিয়ায় মারা যেত। তাই সাধারণ মানুষ শহরে আসতে ভয় পেত। সুদুর অতীতে রংপুর জেলা যে রণভূমি ছিল তা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়। ত্রিশের দশকের শেষ ভাগে এ জেলায় কৃষক আন্দোলন যে ভাবে বিকাশ লাভ করে ছিল তার কারণে রংপুরকে লাল রংপুর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

ঠাকুরগাঁও জেলা

ঠাকুরগাঁও এর আদি নাম ছিল নিশ্চিন্তপুর। ঠাকুরগাঁওয়ের নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে আর যা পাওয়া গেছে তা হল— বর্তমানে যেটি জেলা সদর অর্থাৎ যেখানে জেলার অফিস-আদালত অবস্থিত সেখান থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তরে আকচা ইউনিয়নের একটি মৌজায় নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীশ চক্রবর্তী নামে দুইভাই বসবাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তারা সেই এলাকায় খুব পরিচিত ছিলেন।সেখানকার লোকজন সেই চক্রবর্তী বাড়িকে ঠাকুরবাড়ি বলতেন। পরে স্থানীয় লোকজন এই জায়গাকে ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও বলতে শুরু করে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারী ৫টি থানা নিয়ে ঠাকুরগাঁওজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ জেলা

সুফি-সাধক হযরত শাহজালাল (র.) এর অনুসারী হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দীন (র.) এর পূর্ণস্মৃতি বিজড়িখোয়াই, কারাঙ্গী, বিজনা, রতনা প্রভৃতি নদী বিধৌত হবিগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন জনপদ।ঐতিহাসিক সুলতানসী হাবেলীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ সুলতানের অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর পুত্র সৈয়দ হাবীব উল্লাহ খোয়াই নদীর তীরে একটি গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসরে হবিগঞ্জ নামকরণকরা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ হবিগঞ্জ জেলায় উন্নীত হয়।

মৌলভীবাজার জেলা

হয়রত শাহ মোস্তফা (র.) এর বংশধর মৌলভী সৈয়দ কুদরতউল্লাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মনু নদীর উত্তর তীরে কয়েকটি দোকান ঘর স্থাপন করে ভোজ্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেন।মৌলভী সৈয়দ কুদরতউল্লাহ প্রতিষ্ঠিত এ বাজারে নৌ ও স্থলপথে প্রতিদিন লোকসমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে।ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমের মাধ্যমে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মৌলভীবাজারের খ্যাতি। মৌলভী সাহেবেরপ্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরুপ এই অঞ্চলের নাম হয় মৌলভীবাজার। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী মৌলভীবাজার মহকুমাটি জেলায় উন্নীত হয়।

সুনামগঞ্জ জেলা

‘সুনামদি’ নামক জনৈক মোগল সিপাহীর নামানুসারে সুনামগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। ‘সুনামদি’ (সুনাম উদ্দিনের আঞ্চলিক রূপ) নামক উক্ত মোগল সৈন্যের কোন এক যুদ্ধে বীরোচিত কৃতিত্বের জন্য সম্রাট কর্তৃক সুনামদিকে এখানে কিছু ভূমি পুরস্কার হিসাবে দান করা হয়। তাঁর দানস্বরূপপ্রাপ্ত ভূমিতে তাঁরই নামে সুনামগঞ্জ বাজারটি স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে সুনামগঞ্জ নামের ও স্থানের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে।

সিলেট জেলা

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ অঞ্চলকে বিভিন্ন নামের উল্লেখ্য আছে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে শিবের স্ত্রী সতি দেবীর কাটাহস্ত (হাত) এই অঞ্চলে পড়েছিল, যার ফলে 'শ্রী হস্ত' হতে শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি বলে হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঐতিহাসিক এরিয়ান লিখিত বিবরণীতে এই অঞ্চলের নাম "সিরিওট" বলে উল্লেখ আছে। এছাড়া, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে এলিয়েনের (অরষরবহ) বিবরণে "সিরটে", এবং পেরিপ্লাস অবদ্যা এরিথ্রিয়ান সী নামক গ্রন্থে এ অঞ্চলের নাম "সিরটে" এবং "সিসটে" এই দুইভাবে লিখিত হয়েছে।অতপর ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এ অঞ্চলের নাম "শিলিচতল" উল্লেখ করেছেন তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী দ্বারা বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলিম সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটলে মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দলিলপত্রে "শ্রীহট্ট" নামের পরিবর্তে "সিলাহেট", "সিলহেট" ইত্যাদি নাম লিখেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ মিলে। আর এভাবেই শ্রীহট্ট থেকে রূপান্তর হতে হতে একসময় সিলেট নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন। এছাড়াও বলা হয়, এক সময় সিলেট জেলায় এক ধনী ব্যক্তিরএকটি কন্যা ছিল। তার নাম ছিল শিলা। ব্যক্তিটি তার কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি হাট নির্মাণ করেন এবংএর নামকরণ করেন শিলার হাট। এই শিলার হাট নামটি নানাভাবে বিকৃত হয়ে সিলেট নামের উৎপত্তিহয়।

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ জেলা

ময়মনসিংহ জেলার নাম নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহ'র জন্যএ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই থেকে নসরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি। সলিম যুগের উৎস হিসেবে নাসিরাবাদ, নাম আজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও নাসিরাবাদ কথাটিউল্লেখ্য করা হচ্ছে না। ১৭৭৯ সালে প্রকাশিত রেনেল এর ম্যাপে মোমেসিং নামটি 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলকেই নির্দেশ করে। তার আগে আইন-ই-আকবরীতে 'মিহমানশাহী' এবং 'মনমনিসিংহ' সকার বাজুহার পরগনা হিসেবে লিখিত আছে। যা বর্তমান ময়মনসিংহকেই ধরা হয়।

শেরপুর জেলা

বাংলার নবাবী আমলে গাজী বংশের শেষ জমিদার শের আলী গাজী দশ কাহনিয়া অঞ্চল দখল করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই শের আলী গাজীর নামে দশ কাহনিয়ার নাম হয় শেরপুর।

নেত্রকোণা জেলা

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৮০ খিস্টাব্দে হওয়া নেত্রকোণা মহকুমাকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি নেত্রকোণা জেলা করা হয়। নেত্রকোণার নামকরণ হয়েছে নাটেরকোণা নামক গ্রামের নাম থেকে।

জামালপুর জেলা

সাধক দরবেশ হযরত শাহ জামাল (র.) এর পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমন্ডিত গরো পাহাড়েরপাদদেশে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বাংলাদেশের ২০-তম জেলা জামালপুর। হযরত শাহ জামাল (র.) এরনামানুসারে জামালপুরের নামকরণ হয়।

তথ্যসূত্র: জেলা তথ্য বাতায়ন, উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত।

www.bdniyog.com

আশা করি, আমার বইটি পড়ে কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন।

সবাই দোয়া করবেন আমার জন্যে যাতে আরও লিখতে পারি। ধন্যবাদ।

www.bdniyog.com

আমার সাথে যুক্ত হোন:

ফেইসবুক আইডি: www.facebook.com/NaazimKhanBD

ই-মেইল: ctgnazimkhan@gmail.com

নাজিম খান

জন্ম ও পরিচয়:

নাজিম খান (জন্ম: ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০০০) একজন কবি, বহুভাষাবিদ ও উইকিপিডিয়ান, যিনি সর্বাধিক নাজিম উদ্দিন নামে পরিচিত, চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন। তিনি শান্ত-শিষ্ট, কোমল স্বভাবের একজন ব্যক্তি। তিনি বর্তমানে যথাক্রমে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছেন।

প্রাথমিক জীবন:

নূরানি মাদরাসায় তথা ছোট বয়েসে তিনি পড়াশোনায় খুব দূর্বল ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণি কীভাবে যেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি পড়াশোনায় ভালো করতে থাকেন। পরে তিনি মাদরাসা আরাবিয়া খাইরিয়া নামক একটি মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। সেখানেও তিনি কখনও প্রথম আবার কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। এরপর তিনি বারখাইন জামেয়া জমহুরিয়া ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি এইচএসসি বা আলিম শেষ করেন। পড়াশোনার অর্ধেক কাটিয়ে দেয় প্রতিষ্ঠানে। কতগুলো বন্ধুও জুটান সেখানে। তারপর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

www.bdniyog.com

‘বাংলাদেশের জেলাসমূহের নামকরণের ইতিহাস’ নাজিম খান দ্বারা লিখিত বইটি অত্যন্ত ভালো। আপনারা এখান থেকে জেলা মনে রাখার টেকনিক শিখতে পারবেন। তাছাড়া বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ইতিহাসও এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

“বইটি বিনামূল্যে অনলাইন পিডিএফ আকারে লিখিত। তাই, কেউ অর্থ দিয়ে কেউ বইটি কিনতে বিভ্রান্ত হবেন না।”

নাজিম খান

www.bdniyog.com